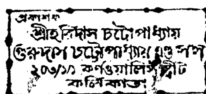
নন্দিনী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নন্দিনী



দাম—দেড় টাকা

হেমন্ত, ১৩৩৮

প্রিণ্টার—শ্রীকরুণাময় আচার্য্য
রামকুমার মেশিন প্রেস
১৬৩, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মাকে দিলাম

মাকে দিলাম

নন্দিনী

মেয়ের আদর দেখিলে গা জ্বালা করে। ঝি-চাকরেরাও আড়ালে-আবডালে নাক সিঁটকায়। বলে:

'দু'দিন বাদে যে পরের বাড়ী চলে যাবে তার আবার অত কেন?'

কিন্তু মায়ের মন,—একটিমাত্র মেয়ে, মানা মানে না। ছেলেটি ছোট। বলে, 'ছেলে ত' চিরকালের বাছা, আদর-যত্ন মেয়েকেই করতে হয়।'

মেয়ের তখন আর মাটিতে পা পড়ে না। সোহাগে-আহ্লাদে যেন থই-থই করে।

রং ফরসা। চেহারা মন্দ নয়। গয়না-গাঁটিতে গা একেবারে বোঝাই। বয়স তেরোর চেয়ে বরং কিছু

বেশি, কিন্তু দেখিলে মনে হয়—ষোলো-সতেরোর কাছাকাছি।

মেয়ে নাকে এখনও নোলোক্ পরে।

মা বলে, 'উঠে গেচে কি লা ? উঠে আবার যায় নাকি কিছু! কই, ছাখ্ ত' মা সুখদা!' বলিয়া চাকরাণীকে তাহার কাছে ডাকিয়া দেখায়। মেয়ের মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলে, 'ছাখ্ ত' মা, কেমন মানিয়েছে!'

ঘাড় নাড়িয়া সুখদা বলে, 'বেশ।'

মেয়ে এ-বেলার কাপড় ও-বেলায় আর পরে না। এ-বেলার গহনা ও-বেলায় অচল।

সৌদামিনী বলে, 'মেয়ে আমার রাজরাণী হবে।'

তা এমন বিচিত্র কিছু নয়। সৌদামিনী জমিদার-গৃহিণী। রাজরাণী হয়ত সে হইতেও পারে।

কিন্তু সঙ্কল্প মানুষের, সিদ্ধি বিধাতার

রাজরাণী সে হয় নাই।

এখন সৌদামিনী বলে, 'ইচ্ছে ক'রেই মল্লিকাকে আমি অমনি ঘরে দিলাম বাছা! না দিলে আমার যখন-খুশী দেখতে পেতাম না যে!'

লোকে ভাবে, হয়ত' তাই।

সৌদামিনী আবার তাহাকে কাছে ডাকিযা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেয়; বলে, 'অমন কুলীন আর এদেশে কোথাও নেই।'

তাহাও হয়ত' সত্য হইতে পারে।

কিন্তু গরীবের ঘরে বিবাহ দিয়াও মেয়েকে যখন-খুশী দেখিতে পাওয়া বড় শক্ত।

আমের সময় আম, কাঁঠালের সময় কাঁঠাল, লিচু-লেবু, তরি-তরকারি, কাপড়-জামা, যখনকার যা—তত্ত্ব করিয়া মল্লিকার কাছে লোক পাঠানো হয়। মেয়ে-জামাইকে আসিবার জন্য অনুরোধের আর অন্ত থাকে না।

জামাইএর বাড়ীতে মাত্র বুড়া ঠাকুরদাদা আর এক বিধবা পিসি।

তত্ত্ব লইয়া মেয়ে জামাইকে যে আনিতে যায়, বুড়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া বসায়; বসাইয়া বলে, 'বসেছ?'

সাড়া পাইলে পর, হাত বাড়াইয়া বুড়া হাত্‌ড়াইয়া হাত্‌ড়াইয়া তাহার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলে, 'চোখে আমি ভালো দেখতে পাইনে বাবা। দিদিমণিকে তুমি আমার নিয়ে যেতে চাও। কেমন ?'

'হ্যাঁ কত্তা, দিন একবার পাঠিয়ে। ওদিকে মা নইলে কেঁদে কেঁদে সারা হ'লো।'

হো হো করিয়া হাসিয়া বৃদ্ধ তাহাকে চুপ করাইয়া দেয়। বলে, 'আমরা বুঝি কাঁদব না ? আমরা কাঁদতে জানিনে, না ? বৌমা চলে গেলে আমাদেরও ঘর যে অন্ধকার বাবা! যাক্, ও-সব স্নেহ-মমতার কথা তুমি বুঝবে না। তুমি ছেলেমানুষ।'

লোকটি বলে, 'তাহলে মাকে গিয়ে আমি কি বলব বলুন ? এই নিয়ে ত' অনেকবার হলো।'

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলে, 'অনেকবার হলো ; না ?'

বলিয়াই মৃদু একটুখানি হাসিয়া বলে, 'আচ্ছা ডাকো আমার বৌদিদিমণিকে ডাকো এইখানে।'

অদূরে দাঁড়াইয়া মল্লিকা বোধকরি সবই শুনিতেছিল, তৎক্ষণাৎ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল :

'ডাক্‌ছেন আমায় ?'

ঘাড় নাড়িয়া বৃদ্ধ বলিল, 'হ্যাঁ দিদি, ডাকছি। আচ্ছা, সেই যে, যে-কথাটা তোমার মাকে তুমি বলবে বলেছিলে এই নিয়ে ক'বার বলা হলো ?'

সে যে এ-প্রশ্ন করিবে তাহা সে ভাবে নাই। চুপ করিয়া হেঁট্‌মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মল্লিকা তাহার পায়ের নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ বলিল, 'লজ্জা কিসের ? বল !'

ভয়ে-ভয়ে অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে মল্লিকা কহিল, 'চার বার।'

বৃদ্ধ আবার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না, তুমি ভুল বললে দিদি ! আমার ঠিক মনে আছে। চিঠি লিখে জানিয়েছ দু'বার, আর লোকের মুখে বলে' পাঠানো হয়েছে চার বার। এই নিয়ে ছ'বার হ'লো।' এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া বৃদ্ধ বলিল, 'আর তোমায় নিতে এসে ফিরে গেছে ক'বার ?'

মল্লিকা বলিল, 'তিনবার।'

বৃদ্ধের দন্তহীন মুখে আবার হাসি ফুটিল। সম্মুখে উপবিষ্ট ব্যক্তিটিকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, 'হ'লো ত'? শুন্‌লে ত' বাবা? সুতরাং এবারও তুমি বল গিয়ে যে, ওরে ক্ষ্যাপা মেয়ে, সংসার করতে হ'লে সব জিনিস ভুলে গেলে চলে না। মেয়ে যদি আব্দার করে' কিছু চেয়েই বসে ত' সেটা তাকে দিতে হয়। না দিলে রাগ করে। মেয়ে যাবে কেন? কিছুতেই যাবে না।'

আরও কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল, মল্লিকার বাপের বাড়ীর লোকটি জিজ্ঞাসা করিল:

'কি চেয়েছিস্ রে মল্লিকা?'

মল্লিকা বলিল, 'এক হাজার টাকা নায়েব-মশাই। আপনি বাবাকে বলবেন।'

শেষের কথাটা এম্‌নিভাবে মল্লিকার গলায় আট্‌কাইয়া গেল যে, সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা তাহার পক্ষে আর সম্ভব হইল না, চোখে কাপড় চাপা দিয়া তৎক্ষণাৎ সে সেখান হইতে একরকম ছুটিয়াই পলায়ন করিল।

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'এষ্টেটের নায়েব আপনি ? ও হো হো, তাহ'লে ত' আপনার উপযুক্ত সম্মান আমি করতে পারলাম না দেখছি ! তা—তা আপনি যেন আমার অপরাধ···আমি বুড়ো মানুষ, তার ওপর দেখতেই ত' পাচ্ছেন···আচ্ছা, দিদিমণি, টাকাটা তুমি কি-জন্যে চেয়েছিলে তাও ত' ওঁকে শুনিয়ে দিতে পার !'

নায়েব বলিল, 'মল্লিকা চলে' গেছে।'

বৃদ্ধ বলিল, 'দেখলেন ? মা-বাপের ওপর কি-রকম রেগেছে দেখলেন ? ছি-ছি, টাকাটা এতদিন ওঁদের পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। ব্যাপারটা শুনবেন তবে ? শুনুন। শোনা আপনার উচিত।—কথায়-কথায় সেদিন মাছের কথা উঠলো। বললাম, 'আমার ত' দিদি পুকুর নেই, মাছ হয়ত তোমায় আমি সবদিন খেতে দিতে পারব না। এই না শুনে' দিদিমণি আমার বলে' উঠলো পুকুর আমি কিনব। তারপর আমি আর কোনও খবর রাখিনি। ভেতরে ভেতরে বৌমা যে এত কাণ্ড করেছেন তাও জানতাম না। হঠাৎ একদিন শুনি, রায়দের

পুকুরটা নাকি দিদিমণি কেনবার সব ঠিক্‌ঠাক্‌ করে' ফেলেছেন। দাম পর্য্যন্ত স্থির হয়ে গেছে—হাজার টাকা। দিদিমণি বলে, আমার গয়না বিক্রি করে' পুকুর কিনুন। জমিদারের মেয়ে কিনা, বিষয়-সম্পত্তির মর্য্যাদা ঠিক বোঝে। বললাম, রামঃ, গয়না কি আর বিক্রি করতে আছে দিদি? লোকে বলবে কি? তার চেয়ে কথা যখন ওদের দিয়েছ দিদি, টাকা তোমার মা-র কাছে চেয়ে পাঠাও। এক হাজার টাকা তৎক্ষণাৎ তিনি পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু চাওয়া ত' এই নিয়ে হলো ছ'বার।'

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বৃদ্ধ খানিক্ থামিয়া আবার বলিতে লাগিল, 'মনে ওর বড় আঘাত লেগেছে, বুঝলেন? রায়েরাও বার-বার তাগাদা দিচ্ছে, দিদিও আমার লজ্জায় তাদের মুখ দেখাতে পারে না। তাই ও মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছে—টাকা যতদিন না পাঠাবে বাপের বাড়ী ততদিন ও যাবে না। আমি অনেক করে' বুঝিয়ে দেখেছি নায়েব-মশাই, কিন্তু......'

বলিয়া বৃদ্ধ তাহার মাথাটি বার-কতক্ নাড়িয়া বলিল, 'কিছুতেই না। হাজার হোক্, বনেদি ঘরের

মেয়ে ত! আর-কিছু না থাক্, আত্মসম্মান জ্ঞানটুকু ওর পুরো মাত্রায় আছে।'

নায়েব উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'তাহ'লে আসি আমি।' বলিয়াই হাত বাড়াইয়া বৃদ্ধের দু'টি পায়ে হাত দিয়া সেই হাতটি সে আবার তাহার মাথায় ঠেকাইল।

বৃদ্ধ বলিল, 'মঙ্গল হোক্!······কই, দিদিমণি কি আমার চলে' গেছে?'

নায়েব বলিল, 'হ্যাঁ।'

বৃদ্ধ তখন অপেক্ষাকৃত নীচু গলায় বলিতে লাগিল, 'দিদিটি আমার ভারি চাপা, মুখ ফুটে সহজে কোনও কথাই বলতে চায় না। আমি বলি কি, তা যদি তুমি নিজের নামে বলতে লজ্জা কর দিদি, টাকা তুমি আমার নাম করেই চেয়ো। আমি বুড়োমানুষ, দু'দিন বাদে মরে' যাব; আমার আর কি বাবা, ওদের জন্যেই সব।···যাও তাহ'লে, যাবার সময় একবার দেখা করে' যাও দিদিমণির সঙ্গে।'

মল্লিকার সঙ্গে নায়েব দেখা করিতে গেল।

সদর দরজাটা বন্ধ না করিলে বৃদ্ধ রসিকলালের ঘুম হয় না।

অথচ স্বামী ঘরে না ফিরিলে দরজা বন্ধ করিতে মল্লিকার একটুখানি বাধে।

কিন্তু রসিকলাল ছাড়িবার পাত্র নয়। বারে-বারে দরজা বন্ধ করিতে বলিয়া বলিয়া যখন হায়রাণ হইয়া ওঠে, তখন সে চেঁচাইতে স্বরু করে। বলে, 'কই গো, মা-লক্ষ্মীরা, কথা কি আমার শুনবে না? নাত-বৌ বন্ধ করতে না পারে, কামিনী কি করছিস্?'

কামিনী তাহার বিধবা মেয়ে। কোথায় কোন্ তীর্থে গিয়া মাথার চুলগুলা কাটিয়া দিয়াছে, কম-বয়সেই দাঁত ভাঙ্গিয়াছে, রোগে শোকে জরাজীর্ণ হইয়া দিবারাত্রি একরকম চুপ করিয়া বসিয়াই থাকে। এবং তাহার এই চুপ করিয়া বসিয়া থাকার কথাটা কেহ উল্লেখ করিলেই তাহাকে সে বাক্যবাণে একেবারে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলে। বাপ তাহার একে বুড়া, তায় অন্ধ; বারে-বারে কথার যন্ত্রণা দেওয়া তাহাকে উচিত নয়, অথচ কথা না বলিয়াও সে থাকিতে পারে না। অতি

কষ্টে উঠিয়া গিয়া দরজাটা সে সশব্দে বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়াই বাপের একখানা হাত ধরিয়া চড়্ চড়্ করিয়া তাহাকে সজোরে টানিয়া তুলিতে তুলিতে বলে, 'ওঠো, চল, শোবে চল।'

রসিকলাল বলে, 'থাম্। অত জোরে জোরে টানিস্‌নে। হাতটা যে গেল।'

কামিনী বলে, 'যাক্। কথা শুনলে গা জ্বালা করে! মা-লক্ষ্মী যাকে বলছ, তাকেই বল, আমাকে কেন?'

রসিকলাল উঠিয়া দাঁড়ায়। বলে, 'তা বই-কি! এত রাত পর্য্যন্ত দরজায় খিল্ দিবিনে, শেষে কোন্‌দিন চুরি-ডাকাতি হয়ে যাক্।'

কামিনী বলে, 'যায় ত যাবে, যার যাবে তার যাবে, আমার কি! তোমার টাকাকড়ি থাকলেও যা আমার না থাকলেও তাই। বাবা রে বাবা, হে ভগবান, মেয়ে হয়ে যেন কেউ না জন্মায়!'

কামিনীর চিরকাল ওই এক নালিশ!—ছেলে হইলে সে বিষয়-সম্পত্তির ভাগ পাইত, মেয়ে হইয়া

জন্মিয়াছে বলিয়া বাপের বিষয়ে তাহার আর কোনও অধিকার নাই!

রসিকলালেরও সেই এক কথা! চুপি-চুপি বলে, 'থাম্ পাগ্‌লী থাম্। তোর আমি সব ব্যবস্থাই করে' দিয়ে যাব।'

কামিনী বিশ্বাস করে না। বলে, 'সে আমি জানি।'

বলিয়াই এদিক-ওদিক তাকাইয়া কমিনী অত্যন্ত ধীরকণ্ঠে বলিতে থাকে, 'দরজা বন্ধ করতে যে বলছ, কিন্তু তোমার সে নাতিটি যে এখনও...'

কথাটা তাহাকে শেষ করিতে হয় না, রসিকলাল চেঁচাইয়া ওঠে, 'আসেনি? না? শালাকে আমি হাজার দিন্ বারণ করি, বলি, যাত্রা-থিয়েটার নিয়ে মেতে থাকলে ত' আর দিন চলবে না, তার চেয়ে বরং জমি-জায়গাগুলো ছাখ্, রায়েদের পুকুরটা যাতে...বৌটা রয়েছে নাকি এখানে?'

কামিনী তাহার বাবার হাতে একটা চিম্‌টি কাটিয়া দিয়া বলে, 'হ্যাঁ, চুপ কর।—এই যে, এইদিকে এসো, চৌকাঠ্‌টা ডিঙিয়ে—'

বাবাকে ঘরে শোয়াইয়া দিয়া কামিনীও ঘুমাইয়া পড়ে।

নিস্তব্ধ গ্রাম। কোথাও কাহারও সাড়াশব্দ নাই।

মল্লিকা শুধু একলা ঘরে জাগিয়া বসিয়া আছে। স্বামী তাহার কখন আসিবে কে জানে।

সহসা ধুপ্ করিয়া একটা শব্দ হইতেই মল্লিকা উঠিয়া বসিল। দরজা তাহার খোলাই ছিল। জুতা-জোড়াটা হাতে লইয়া যোগীন ঘরে ঢুকিয়া চাপা-হাসিতে মুখখানা উজ্জ্বল করিয়া বলিল, 'চুপ্! আজও তেমনি পাঁচিল্ টপ্‌কে এসেছি।'

বৃদ্ধ রসিকলালের ঘর হইতে চীৎকার শোনা গেল, 'ও কিসের শব্দ র‍্যা!'

ভাদ্র মাস। বাড়ীর কাছাকাছি এদিকে-ওদিকে কয়েকটা তালের গাছ আছে। সময় অসময় অমনি ধুপ্‌ধাপ্ করিয়া তাল পড়ার শব্দ শোনা যায়। মল্লিকা বলিয়া দিল, 'কোথায় যেন তাল পড়লো।'

রসিকলাল জিজ্ঞাসা করিল, 'যোগীন এসেছে?'

মল্লিকা একবার তাহার স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

'দরজা কে খুলে দিলে ?'

মল্লিকা বলিল, 'আমি।'

'কই, শব্দ পেলাম না যে ?'

মল্লিকা চুপ করিয়া রহিল। দাঁত কিসমিস্ করিয়া যোগীন বলিল, 'শা-লা।'

মল্লিকার হাসি যেন আর ধরে না! হাসিতে হাসিতে জল গড়াইয়া আসন পাতিয়া খাবার ঢাকা খুলিয়া দিয়া বলিল, 'এসো।'

যোগীন খাইতে বসিল। মল্লিকা পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

যোগীন জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার বাপের বাড়ীর সেই নায়েব না কে—চলে' গেছে ?'

মল্লিকা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

'বুড়ো টাকার কথা বলেনি ?'

'বলেছিল।'

যোগীন বলিল, 'আচ্ছা ছাখো ত' বুড়োর আক্কেল,

বলে কিনা পুকুর কিনে মাছের চাষ করার মত লাভ নেই। ধেৎ তেরি, তার হাঙ্গামা কত! এত টুকু-টুকু পোনা, রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, চোর-ডাকাতের হাত থেকে অগ্‌লাও, কেউ ছিপ্‌ ফেললে কি না দেখে এসো, তারপর বড় হবে পঁচিশ বচ্ছুর পরে। ততদিন কে মরবে কে বাঁচবে তার ঠিক নেই। বল ঠিক কিনা?'

মল্লিকা ঈষৎ হাসিল।

দু'এক গ্রাস খাইয়া যোগীন আবার বলিতে লাগিল, 'তার চেয়ে ওই এক হাজার টাকা দাও আমার হাতে, মাসে হাজার টাকা না কামাতে পারি ত' কী! পাঁচশ' টাকা ত' ফেলে-ছড়িয়ে! কলকাতার সেই নির্ম্মলা অপেরা পার্টির লাভ কত জানো? বাপ্‌রে বাপ্‌! ভাবলে গালে হাত দিতে হয়।...আমাদের ধরো স্থবিধে কত! মেন্‌ এ্যাক্‌টার্‌ ত' নিজে, ম্যানেজারও নিজে, বাকি যে-ক'জন থাকবে দু'দশটাকা ক'রে দিলেই—ব্যাস্‌! ছ'মাস বাইরে ঘুরে বেড়াব, ছ'মাস ব'সে থাকব। ভাল যাত্রার দলের ডিম্যাণ্ড্‌ কত!'

বলিয়া সে মল্লিকার মুখের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া খাইতে আরম্ভ করিল।

খাওয়া শেষ হইলে বলিল, 'টাকাটা এসে গেলে তুমি আমার হাতে দিয়ো, তারপর আমি দেখে নেবো বুড়ো কেমন করে' পুকুর কেনে।'

মল্লিকা একটি কথাও বলিল না, হাত হইতে পাখাটা নামাইয়া পানের বাটায় পান আনিতে গেল।

* *

*

হাজার টাকার আশায় নাতি-ঠাকুরদাদা দু'জনেই বসিয়া আছে, এমন দিনে রাধানগর হইতে দারুণ এক দুঃসংবাদ আসিয়া উপস্থিত।

মল্লিকার যে একটিমাত্র ভাই ছিল, তিন দিনের জ্বরে তাহার সে-ভাইটি হঠাৎ মারা পড়িয়াছে।

মল্লিকা ত' কাঁদিয়া-কাটিয়া অস্থির! তাহাকে চুপ করানো দায়।

জামা-জুতা পরিয়া যোগীন তাহাদের যাত্রার রিহার্স্যাল্ দিতে বাহির হইতেছিল, কামিনী বলিল, 'বাবা তোকে ডাকছে যোগীন!'

বৃদ্ধ রসিকলাল তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে বসিয়া তামাক টানিতেছিল, বলিল, 'কে? যোগীন? আয়, বোস্।'

যোগীনের বসিবার অবসর ছিল না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই বলিল, 'কি বলছ বল।'

রসিকলাল জিজ্ঞাসা করিল, 'বৌদিমণি কি করছে?'

যোগীন বলিল, 'কাঁদছে, আবার কি করবে?'

মাথা নাড়িয়া বৃদ্ধ বলিল, 'কাঁদুক্। কাঁদলে-আমাদের দুঃখের অনেকটা লাঘব হয়।'

এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া বৃদ্ধ আবার বলিতে আরম্ভ করিল, 'কিন্তু এই আমি বলিহারি যাই যোগীন, যা ভাবলাম, শেষ পর্য্যন্ত ঠিক সেই রকমটিই হয়ে গেল। তোর বাবা যখন মারা গেল, মা গেল,—সবাই বলতে লাগল—ছেলেটা বড় অপয়া

ছেলে। একমাত্র আমি তার পিতিবাদ করলাম; বললাম,—না। তার কারণ কি জানিস্? রতু স্যাক্‌রা একবার আমার কাছে পঁচিশটি টাকা ধার নেয়, তারপর দেবো দেব্বো করে' দিতে আর কিছুতেই পারে না, শেষকালে যায় মরে'। ভাবলাম, টাকা আমার গেল। লেখাপড়া নেই, হ্যাণ্ডোলোট্ নেই, টাকার আশা আমি ছেড়েই দিয়েছিলাম। তারপর—তোর যেদিন জন্ম হ'লো, আমার ঠিক মনে আছে, চোখে আমি তখন দেখতে পেতাম। বর্ষাকাল, ঝম্ ঝম্ করে' বৃষ্টি পড়ছে, হঠাৎ দেখি, জলে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে ঘোম্‌টা টেনে একটি মেয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললাম, 'কে মা? কি জন্যে এসেছ?' মেয়েটি তার আঁচলের একটি গিঁট খুলে তিরিশটি টাকা আমার পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে ধীরে-ধীরে বললে, 'কালোর বাবার কাছে পঁচিশটি টাকা আপনি পেতেন। পাঁচটি টাকার বেশি স্মুদ আমি আর দিতে পারব না বাবা, ওই নিয়ে আজ আমাকে ছেড়ে দিতে হবে।' হিসেব করে' দেখতে গেলে স্মুদ হয়েছিল পঞ্চাশ টাকার ওপর! তা দিলাম

ছেড়ে। কিন্তু ওই যে তিরিশটে টাকা পেলাম, সেও কি আর তুই না জন্মালে পেতাম ভেবেছিস? কখনো না।' বলিয়া বৃদ্ধ একবার ঘাড় নাড়িয়া গড়গড়ার নলটা হাত হইতে নামাইয়া দিয়া বলিল, 'সেই থেকে আমি জানি যে, তোর অর্থভাগ্য প্রবল।...নানান্ জায়গা থেকে বিয়ের সম্বন্ধ এলো, কিন্তু সব ভেঙ্গে-চুরে' অনেক ভেবেচিন্তে—দিলাম শেষে রাধানগরে।'

হঠাৎ কাহার পায়ের শব্দ পাইয়া রসিকলাল বলিয়া উঠিল, 'কে?'

কামিনী একটা পাথরের খল্-নুড়ি হাতে লইয়া তাহার ঔষধ দিতে আসিয়াছিল, বলিল, 'আমি।'

রসিকলাল বলিয়া উঠিল, 'এখানে ঘুর্-ঘুর্ করছিস্ কেন মা দিনরাত? আমাদের নাতি-ঠাকুরদাদার দুটো মফঃস্বলী কথা হচ্ছে, তাও হ'তে দিবিনে?'

কামিনী বলিল, 'তোমারই পিণ্ডি ওষুধ দিতে এসেছিলাম্। ওই রইলো ওইখানে, খেতে হয় খেয়ো।' বলিয়া নাক সিঁট্কাইয়া বিরক্ত হইয়া হন্ হন্ করিয়া সে চলিয়া গেল।

'থাক্' বলিয়া বাঁ-হাত দিয়া হাত্ড়াইয়া খল্-নুড়িটা একবার স্পর্শ করিয়া, এইবার অত্যন্ত নিম্নকণ্ঠে কহিল, 'হ্যাঁ, কি বলছিলাম···তারপর, বিয়ে যখন দিলাম ওখানে, আমার তখনই কেমন যেন মনে হয়েছিল, রাধানগরের জমিদারী···ও আমার নাতির হাতে এলো-ব'লে। তারপর এই ছ্যাখ্ না ভাই, হাতে-হাতে ফলে' গেল কিনা ছ্যাখ্। অবিনাশবাবুর এমন ছেলে, জ্বর নেই, জ্বালা নেই, তিনটি দিনের দিনেই কেমন ধড়্ফড়িয়ে—'

বলিয়া কথাটা শেষ না করিয়াই ঠোঁটের ফাঁকে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'হাজার টাকা হাজার টাকা করছিলাম, এখন কত হাজার টাকা তুমি কত লোককে দান করবে ভাই! তাই বলছিলাম কি জানো?'

যোগীন তখন তাহার যাত্রার দলের স্বপ্ন দেখিতেছিল। দেখিতেছিল, চুম্কি-দেওয়া রাজার পোষাক পরিয়া, কোমরে তলোয়ার বাঁধিয়া, মাথায় মুকুট দিয়া, বুকে একবুক মেডেল্ ঝুলাইয়া, সে তখন আসরের মাঝখানে বক্তৃতা করিতেছে, চারিদিকে নীরব নিস্তব্ধ মুগ্ধ

জনতা, চিকের আড়ালে মেয়েরা বসিয়া আছে, ছেলেরা পর্য্যন্ত টুঁ শব্দটি করিতেছে না···এমন সময় নিদ্রোত্থিতের মত নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে সে তাহার বৃদ্ধ পিতামহের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়া উঠিল, 'অাঁ ?'

রসিকলাল বলিল, 'দিদিমণিকে এতদিন পাঠাইনি, কিন্তু এবার হচ্ছে গিয়ে আমাদের নিজের গরজ। ওরা নিতে আসবার আগে, কাল্‌কেই তুমি ওকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাও। বুঝলে ভায়া, সেইজন্যেই ডেকেছিলাম।'

মল্লিকাকে লইয়া যোগীন রাধানগরে আসিতেই জমিদার-বাড়ীতে আবার একবার নূতন করিয়া কান্নার রোল উঠিল। মা কাঁদিল, মেয়ে কাঁদিল, বাবা কাঁদিল, এবং তাহাদের দেখাদেখি দাসী-চাকরেরাও কাঁদিতে লাগিল।

মা-বাবা যদিই-বা পথে আছে, মল্লিকার সে চীৎকার করিয়া ধূলায়-মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া ভীষণ কান্না আর কিছুতেই থামে না!

পুত্র-শোকে কাতর মাকেই শেষে বলিতে হইল, 'চুপ কর্ মা, তোর কান্না দেখে বুক আমার ফেটে যাচ্ছে। কি আর করি বল্, বিধাতা বড় নিষ্ঠুর।'

নিষ্ঠুর যে, তাহাতে আর কোনও সন্দেহই নাই। একটি মাত্র পুত্র,—দস্যুর মত তাহাকেও ছিনাইয়া লইয়া কি সুখ যে তাহার হইল কে জানে!

সৌদামিনী বলিল, 'তোকে কিন্তু আমি আর চোখের আড়াল করব না বাছা, তুই এইখানেই থাক্। যোগীনকেও বলেছি।'

থাকিতে পাইলে মল্লিকা বাঁচে, কিন্তু উহারা রাখিবে কি?

দু'চারদিন পরে শোকের মাত্রাটা একটুখানি কমিয়া আসিলে মল্লিকা একদিন রাত্রে তাহার স্বামীকে বলিল, 'ছ্যাখো তোমার কাজকর্ম্ম ত' কিছু নেই, মা আমাদের এই খানেই থাকতে বলছেন; থাকো না!'

যোগীন বেশ লম্বা-চওড়া জোয়ান্, কালো কুচ্‌কুচে গায়ের রং, লেখাপড়া ভাল জানে না, গলার আওয়াজটাও রুক্ষ।

'ধেৎ !' বলিয়া মল্লিকাকে সে এমন জোরে এক ধমক্ দিল যে, মল্লিকা সহসা চমকিয়া উঠিল। তাহার চুপ করিয়া থাকা ছাড়া আর উপায় নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল, বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া পড়িয়া সে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যোগীন ভাবিয়াছিল, ছেলে যখন মরিয়াছে, শ্বশুরবাড়ীতে গিয়াই দেখিবে, শ্বশুরের বিষয়-সম্পত্তি একেবারে তাহার হাতের মুঠার মধ্যে। কিন্তু এখানে আসিয়া হাল-চাল দেখিয়া সে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া বুঝিয়াছে, তাহার এখনও অনেক দেরি। শ্বশুর-শাশুড়ী বাঁচিয়া থাকিতে সে-আশা খুব কম। তবে শেষ পর্য্যন্ত একদিন আসিবেই। সে-কথা যখন স্থির নিশ্চিত, তখন মল্লিকাকে এমন করিয়া তিরস্কার করা উচিত হয় নাই।

বলিল, 'বা-রে, আবার কান্না ছ্যাখো মেয়ের ! ভাল করে' না বুঝে-সুজেই কথা বল, তাইতে বড় রাগ ধরে। কাজকর্ম্ম আমার নেই কি রকম ? 'সুভদ্রা-হরণের' রিহার্স্যাল্ চলছে, আর আমি এইখানে—শ্বশুর বাড়ীতে ধন্না দেবো বুঝি ? মাইরি আর-কি !'

মল্লিকা কোনও কথা বলিল না। উপুড় হইয়া মুখ গুঁজিয়া যেমন কাঁদিতেছিল তেমনি কাঁদিতেই লাগিল।

যোগীন কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া চোঁ চোঁ করিয়া একটা সিগারেট টানিয়া মনে-মনে কি যেন ভাবিল। বলিল, 'আচ্ছা, থাকো তুমি। বুড়োকে আমি বুঝিয়ে বলে' দেবো।'

তাহার পর মল্লিকার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি-চুপি বলিল, 'বাপের বিষয়-সম্পত্তির ত' এখন তুমিই মালিক। না কি বল? আপদ যেটা ছিল সেটা ত' ফর্সা হয়ে গেল।'

আরও কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া মল্লিকা একেবারে শিহরিয়া উঠিয়া শুইয়া শুইয়াই খানিকটা সরিয়া গেল।

যোগীন বলিল, 'সরে গেলে কি হবে? যা সত্যি সেই কথাই বলছি। তবে তার এখনও অনেক দেরি।'

ভাবিয়াছিল, স্ত্রীর কাছ হইতে জবাব একটা সে নিশ্চয়ই পাইবে, কিন্তু জবাবের পরিবর্ত্তে তখনও সে কাঁদিতেছে দেখিয়া যোগীনের রাগ আবার চড়িয়া গেল।

বলিল, 'ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করে' কেঁদো না বাপু, ভাল লাগে না—ধেৎ!'

মল্লিকা চুপও করিল না, কিছু বলিলও না।

পরদিন মল্লিকাকে কাছে ডাকিয়া মা জিজ্ঞাসা করিল, 'জামাই বড় রাগীদার মা, বার-বার কথা বলতে ওকে আমার বড় ভয় করে। তোর এখানে থাকবার কথা বলেছিলি? না তোর বাপকে দিয়ে একবার বলাব?'

মল্লিকা বলিল, 'না মা, বলাতে হবে না। আমি থাকলাম।'

মা'র ভয় হইল। বলিল, 'না মা, জামাই যদি বকে? যদি রাগ করে?'

মল্লিকা বলিল, 'করুক্।'

দেখা গেল, যোগীন রাগ-অভিমান কিছুই করে নাই। পরদিন সকালে সে জুতা পরিয়াই তাহার

শাশুড়ীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'শুনছেন? আমি আজ চললাম।'

সৌদামিনী বসিয়া বসিয়া মল্লিকার চুল আঁচড়াইয়া দিতেছিল। মুখ তুলিয়া বলিল, 'আজই চল্‌লে বাবা? আবার কবে আসবে?'

মল্লিকা তখন তাহার মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া দূরে একেবারে জানালার কাছে সরিয়া গেছে। যোগীন একবার সেইদিক পানে তাকাইয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল :

'কবে আসব? তার কিছু ঠিক নেই। তবে ঘুড়ির লাটাই রইলো এইখানে, ঘুড়ি আর যাবে কোথায়? তাকে আসতেই হবে।'

শাশুড়ী লজ্জায় মরিয়া গেল। রাগে তখন মল্লিকার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। জানলার কাছ হইতে কট্‌মট্ করিয়া তাহার এই নির্ব্বোধ স্বামীটির মুখের পানে তাকাইয়া চোখের ইসারায় সেখান হইতে তাহাকে সে চলিয়া যাইতে বলিল।

কিন্তু যোগীন তাহার সে নীরব চোখের মিনতি

বুঝিল না। স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া সে বেশ জোরে-জোরেই প্রশ্ন করিয়া বসিল, 'কেন? কি হয়েছে কি?'

মল্লিকা কথা বলিবে কি, লজ্জায় একেবারে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়া, মাথা হেঁট করিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই শক্ত সিমেন্টের মেঝের উপর পায়ের বুড়ো আঙুলটা ঘষিতে লাগিল।

সৌদামিনী ভাবিল, তাহার এখানে দাঁড়াইয়া থাকা অন্যায়। মেয়ে-জামাই নিশ্চয়ই দু'টা কথা বলিবে। তাই সে ধীরে-ধীরে সেখান হইতে বাহির হইয়া পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিল। কিন্তু সেখান হইতেও শুনিতে পাইল, জামাই বলিতেছে, 'টাকা আনতে গেল বুঝি?'

অপরাধের মধ্যে মল্লিকা তাহার দুই ঠোঁট্ দিয়া এক-প্রকার শব্দ করিয়া চুপি-চুপি বলিল, 'আ-মর্!' বলিয়াই সে ছুটিয়া গিয়া ভিতর হইতে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

যোগীন বলিয়া উঠিল, 'কি বল্‌লি? মর্? কেন, আমি কেন মরব? একটা আপদ ত' বিদেয় হয়েছে, এইবার তুই হ' না! জ্বালা-জঞ্জাল চুকে যায় তাহ'লে।'

মল্লিকা ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

যোগীনের রাগ তখনও পড়ে নাই। সশব্দে খিল্ খুলিয়া সে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

জুতার শব্দে সৌদামিনী বুঝিল, জামাই চলিয়া যাইতেছে। পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া সে অনুচ্চ-কণ্ঠে ভয়ে-ভয়ে ডাকিল, 'শোনো বাবা যোগীন!'

যোগীন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'কী?'

সৌদামিনী দশ টাকার একখানি নোট তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, 'আবার এসো যেন বাবা, রাগ কোরো না। মল্লিকা ছেলেমানুষ।'

নোটখানি পকেটে পুরিয়া যোগীন বলিল, 'আসব।'

বলিয়াই সে চলিয়া গেল। নিস্তব্ধ বাড়ীর মধ্যে সিঁড়ির উপর জুতার খট্ খট্ শব্দটা মা ও মেয়ে দু'জনেই উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

যোগীন যে-রকম ভাবে গেল, মনে হইল সে যেন আর সহজে ফিরিবে না। কিন্তু সপ্তাহ পার হইতে না হইতেই যোগীন আসিয়া হাজির।

রাত্রে সে-দিন মল্লিকা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে তাহার ঘরে ঢুকিয়া সর্ব্বাগ্রে দরজা-জানালাগুলা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

জিজ্ঞাসা করিল, 'হ'লো সুভদ্রাহরণ?'

যোগীনের মুখখানা কেমন যেন ভার-ভার। বলিল, 'নাঃ। মান্‌কেটার জ্বর হয়ে গেছে। তাছাড়া—'

বলিয়া চুপ করিয়া একটা বিড়ি টানিতে টানিতে ধোঁয়াটা মল্লিকার মুখের উপরেই ক্রমাগত ছাড়িতে লাগিল।

চোখে মুখে নাকে ধোঁয়া লাগিতেই খুক্ খুক্ করিয়া কাশিয়া মল্লিকা একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'তা ছাড়া কি—?'

যোগীন বাঁ-হাত বাড়াইয়া তাহার শাড়ীর এক প্রান্তভাগ ধরিয়া টানিয়া তাহাকে কাছে সরাইয়া

আনিয়া বলিল, 'তাছাড়া শত্‌খানেক্‌ টাকার দরকার। দিতে পার ?'

মল্লিকা বলিল, 'আমি টাকা কোথায় পাব ?'

যোগীন বলিল, 'তোমার ভাবনা কি আজকাল! তুমিই ত' মালিক।'

স্বামীর মেজাজ ভাল ছিল, তাই ভরসা পাইয়া মল্লিকা বলিল, 'কী যে বল ছাই চব্বিশ-ঘণ্টা! ও-কথা বোলো না, ছি! মা যদি শুন্‌তে পায়, কি মনে করবে বল দেখি ?'

যোগীন বলিয়া উঠিল, 'থাম্‌, থাম্‌, আমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না। তুই চুপ কর্‌।'

মল্লিকা বলিল, 'উপদেশ দিই কি সাধে ? কথা বল্‌তে জানো না যে!'

এবার যোগীনের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিবারই কথা। বলিল, 'কী! কি বলিলি ? কথা বলতে জানি না ? আমি ? আচ্ছা, কথা বল্‌তে জানি কি না ছাখ্‌ তবে।' বলিয়া বিড়ির শেষ অংশটুকু হাত হইতে ঘরের কোণের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঁচু খাট হইতে

যোগীন নামিয়া পড়িয়া জামাটা লইবার জন্য দেওয়ালের গায়ে ব্র্যাকেটের দিকে হাত বাড়াইল।

রাগ করিয়া সে চলিয়া যাইতেছে ভাবিয়া মল্লিকা তাড়াতাড়ি তাহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল। বলিল, 'ওগো, তোমার পায়ে পড়ি—তুমি…'

বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

এই অন্ধকার রাত্রে যোগীন যাইবেই বা কোথায়? ধীরে-ধীরে আবার সে খাটের উপর উঠিয়া গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সারারাত্রির মধ্যে মল্লিকা আর ভয়ে তাহাকে একটি কথাও বলিতে পারিল না।

পরদিন নায়েবের কাছে মল্লিকা তাহার গলার এক ছড়া সোনার হার দিয়া বলিল, 'এইটে কোথাও বন্ধক রেখে আমায় একশ টাকা এনে দিতে পারবেন নায়েব-মশাই?'

নায়েব বলিল, 'কেন মা, বন্ধক রেখে টাকা আনতে কেন হবে মল্লিকা? বাবুকে না বল্‌তে পার মাকে বল না! জামাইবাবুকে দিতে হবে বুঝি?'

শেষের কথাটার জবাব না দিয়া মল্লিকা বলিল, 'না, আপনি যেখান থেকে হোক এনে দিন।'

নায়েব হার-ছড়াটি ফেরত দিয়া বলিল, 'এটি তুমি নিয়ে যাও মা, এম্‌নিই আমি এনে দিতে পারব বোধ হয়।'

মল্লিকাকে বাধ্য হইয়া তাহাতেই রাজি হইতে হইল।

এবং সেই দিনই সন্ধ্যায় দেখা গেল, একশ টাকার একখানি নোট হাতে লইয়া নায়েব-মশাই মল্লিকাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

নোটখানি হাতে লইয়া ঈষৎ আনন্দের হাসি হাসিয়া মল্লিকা তাহাকে কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কৃতজ্ঞতার অত্যধিক আবেগে কণ্ঠ তাহার রুদ্ধ হইয়া গেল, মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

দিনকয়েক পরে দোতলার একটা ঘরের মধ্যে বাবা ও মা'র তুমুল ঝগড়া শুনিয়া মল্লিকা হঠাৎ দরজার আড়ালে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

ঝগড়াটা কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে; প্রথম হইতে কথাগুলো সে শুনিতে পায় নাই, তবু তাহার বুঝিতে কিছু আর বাকি রহিল না।

অবিনাশবাবু বলিলেন, 'একশ ছেড়ে তুমি এক হাজার নাও, তার জন্যে ত' কিছু বলছিনে, বলছি শুধু ওই জামাইটাকে দেওয়ার জন্যে।'

সৌদামিনী বলিল, 'থামো। তা কেন বলবে তুমি? তুমি বলছ—আমার জন্যে। ওই যে আমি নিয়েছি, আর তোমার সহ্য হচ্ছে না। বেশ গো বেশ, তোমার সংসারে আমার কোনও অধিকার নেই, তা আমি জানি।'

অবিনাশবাবু বলিতে লাগিলেন, 'না গো না—আমি শুধু এইজন্যে বলছি যে, ওকে যত দেবে, ও ততই পেয়ে বসবে। দেখলে না, হাজারটা টাকার জন্যে কি কাণ্ডটা করলে ওরা। মেয়েটাকে তার জন্যে কত গঞ্জনাই

না সইতে হয়েছে। তবু দিলাম না। দিলাম না শুধু পেয়ে বসবে ব'লে। তোমার জন্যে নয়।'

সৌদামিনী বলিল 'দেবে না তা আমি অনেকদিন থেকেই জানি। ও যে মেয়ে! গরীব লোকের ঘরে বিয়েও দিলাম, তারপর মেয়ে যদি আমার খেতে পাচ্ছি না বলে' হাত পেতে কিছু ভিক্ষে করে ত'—'

বলিতে বলিতে সৌদামিনীর চোখে জল আসিল।

কান্নায় গলাটা তাহার রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তবু সে বলিতে লাগিল, 'অমন জামাইএর হাতে দেখে শুনে তাহ'লে তুমি দিলে কেন,—কেন দিলে? বিয়ের সময় যা দেবার তাই দিয়ে তুমি তাহ'লে ব'লে কেন দিলে না যে, এই শেষ; আর যদি তুই কোনোদিন কিছু চা'স্ত তোর অপরাধ হবে! বাপের সম্পত্তিতে মেয়ের কোনও অধিকার নেই তা আমি জানি—জানি—জানি। কিন্তু অত আদরে মানুষ-করা মেয়ে আমার,—ভাবি যখন, শ্বশুরবাড়ীতে বাছা আমার দু'বেলা পেট ভরে খেতেও পাচ্ছে না তখন তোমার বাড়ীর রাজভোগে যে আমার অরুচি ধরে' যায়···তা জানো? তখন মনে হয়—'

বলিয়া কথাটা সে আর শেষ করিতে পারিল না, পালঙ্কের উপর স্বামী বসিয়াছিলেন, সৌদামিনী তাঁহার পায়ের কাছে মাথা লুটাইয়া দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

অবিনাশবাবু তাহার হাতে ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন। সৌদামিনীর কান্না তাহাতে দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আজ যদি আমার ছেলেটা বেঁচে থাকতো! বাপ হয়ত' মেয়েকে অবহেলা করতে পারে, কিন্তু ভাই করতো না।'

অবিনাশবাবু এইবার তাহাকে অনেক রকম করিয়া বুঝাইলেন। বলিলেন, 'ছি! এই সামান্য কথা নিয়ে··· বেশ হয়েছে একশ' টাকা জামাইকে দিয়েছ, তার জন্যে এত কেন? আমি শুধু এই কথাই বলছি যে, ও-টাকায় আমার মেয়ের কোনও কাজে লাগবে কি? জামাইটা হয়েছে হতচ্ছাড়া হতভাগার একশেষ, যাত্রার দলে বক্তৃতা করে' আর বাজনা বাজিয়ে ঘুরে' বেড়াচ্ছে, যত টাকাই দাও ওকে, ফুর্ত্তি করে' দু'দিনে ফুঁকে দেবে।'

সৌদামিনী সজল চক্ষে মুখ তুলিয়া তাহার স্বামীর পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'ওগো থামো তুমি—চুপ কর, তোমার পায়ে পড়ি। মল্লিকা যদি শোনে ত' তার দুঃখের কিছু বাকি থাকিবে না।'

অবিনাশবাবু চুপ করিলেন। সৌদামিনীও চোখ মুছিয়া ঘর হইতে বাহির হইতেছিল। দেখিল, জানালার পাশ হইতে মল্লিকা তাড়াতাড়ি পলায়ন করিতেছে। যা' ভাবিয়াছিল, তাহাই ঘটিয়াছে। সবই যখন সে শুনিয়াছে, তখন আর বলিতে দোষ কি!

সৌদামিনী ডাকিল, 'মল্লিকা, শোন্!'

লজ্জায় জড়োসড়ো হইয়া মল্লিকা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভিতরে অবিনাশবাবুকে শুনাইয়া শুনাইয়াই সৌদামিনী বলিল, 'ত্যাখ্ মল্লিকা, ওই হতচ্ছাড়া জামাইটাকে দেবার জন্যে আর যদি কোনোদিন কিছু তোর বাবার কাছে কি আমার কাছে চাস্ ত' তোকে আমার দিব্যি রইলো।'

বলিয়াই সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং

তাহার সেই উদ্‌গত অশ্রু গোপন করিবার জন্য হন্ হন্ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। এবং একাকী সেই আধো-আলোকিত আধো-অন্ধকার বারান্দার মধ্যে মল্লিকা শুধু গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু কথাটা বোধকরি রাগের মুখে বলা সৌদামিনীর উচিত হয় নাই। মেয়ে না জানি কি মনে করিয়াছে! এই কথা ভাবিয়া ভাবিয়া সারাদিন সৌদামিনীর চোখে ঘুম আসিল না। এবং তাহার ফল হইল এই যে, কথাটা মল্লিকাকে ভুলাইয়া দিবার জন্য পরদিন হইতে আদর যেন তাহার আরও শতগুণে বাড়িয়া গেল।

চাকর-দাসী সৌদামিনীর ধমকানির চোটে একেবারে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। এবং এই কথাই তাহারা সেদিন হইতে খাঁটি জানিল যে, এ-বাড়ীতে চাকরি বজায় রাখিতে হইলে মল্লিকার সেবা-যত্ন করাই তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

সারা দিবারাত্রির মধ্যে একটি দণ্ডের জন্যও মল্লিকা চোখের আড়াল হইলে সৌদামিনীর চলে না। তৎক্ষণাৎ অমনি চারিদিকে ছুটাছুটি পড়িয়া যায়। বাবুর জন্য মাছ যদি নির্দ্দিষ্ট হয় দু'খানা ত' মল্লিকার চারখানা; বাবু খান একসের দুধ, মল্লিকা খায় দু'সের।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতে সৌদামিনী তাগাদা দেয়,—'বলি ও বামুন-মা, লুচি হ'লো ?'

বামুন-মা তাড়াতাড়ি লুচি-কয়টি ভাজিতে ভাজিতে বলে, 'এই যে মা, হয়ে গেল।'

লোকজনকে তিরস্কার করা সৌদামিনীর স্বভাব নয়, তবু সে বলিতে ছাড়ে না। বলে, 'মেয়ে সেই কখন চারটি খেয়েছে, তোমাদের বেশ আক্কেল যা-হোক্, দাও তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে—দাও।'

বামুন-মা তাড়াতাড়ি হাত চালাইয়া লুচি ভাজিয়া দেয়। থালার চারিদিকে পঞ্চোপচার ব্যঞ্জন সাজাইয়া সৌদামিনী ডাকে, 'আয় মল্লিকা, খাবি আয়।'

বৈকালে একদফা খাইবার পর এত তাড়াতাড়ি

খাইবার ইচ্ছা তাহার না হওয়াই স্বাভাবিক। বলে, ‘না মা, এত সকাল সকাল…’

‘সকাল-সকাল কি লা!’ বলিয়া মা তাহার আঁচল ধরিয়া টানিয়া বসায়। বসাইয়া ঠিক ছোট মেয়ের মত আদর করিয়া বলে, ‘এসো লক্ষ্মী মা আমার, খাইয়ে দিই, নইলে এক্ষুণি বসবে আর উঠবে।’

এই বলিয়া মা তাহার নিজের হাতে লুচি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া মেয়েকে খাওয়াইয়া দিতে থাকে।

ঝি-চাকরেরা দূর হইতে দেখে, আর মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসে।

বিধাতা হাসেন কি না জানি না।

প্রথমবার যোগীন আসিয়াছিল সপ্তাহ পার হইতে না হইতে, এবার আসিল মাস-দুইএক্ পরে।

সৌদামিনী ঘরের মধ্যে একাকী বসিয়াছিল, অবিনাশবাবু প্রবেশ করিলেন—‘কি গো, জামাই এসেছে?’

এমন ভাবে ঘাড় নাড়িয়া ‘হাঁ’ বলিয়া কথাটার সে

জবাব দিল, দেখিয়া মনে হইল, জামাই আসা সৌদামিনী তেমন পছন্দ করে না।

অবিনাশবাবু বলিলেন, 'কেমন? আমার কথাই ঠিক কি না?'

সৌদামিনী বুঝিতে পারে নাই। জিজ্ঞাসা করিল, 'কী তোমার কথা?'

অবিনাশবাবু ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, 'এবার সে দু'মাস পরে এলো, না? টাকাগুলি সব খরচ করে' তার পর এসেছে। কিছু না দিলে সে আরও আগেই আসতো।'

সহসা পাশের একটা ঘর হইতে হারমোনিয়ামের শব্দ শোনা গেল।

অবিনাশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও কে? হারমোনিয়াম কে বাজাচ্ছে?'

সৌদামিনী বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলিবার প্রয়োজন হইল না, হারমোনিয়ামের আওয়াজের সঙ্গে যোগীনের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল,—

'পুঞ্জে পুঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে চললো সঙ্গিনী, চললো রঙ্গিনী!—'

অবিনাশবাবু লজ্জায় সেখান হইতে অন্য পথ দিয়া পলায়ন করিলেন। যাইবার সময় স্ত্রীকে বলিয়া গেলেন, 'তুমি শোনো!'

গান শুনিয়া মল্লিকা ঘরে ঢুকিল। দেখিল, খাটের মাঝখানে বসিয়া ফুটা হারমোনিয়ামটির উপর একটা বালিস চাপা দিয়া যোগীন তন্ময় হইয়া চোখ বুজিয়া গান গাহিতেছে। কাছে গিয়া বলিল, 'ওগো, ওটা তুমি রাখো। ও ভাল বাজছে না।'

শেষের কথাটা তাহার একেবারেই মিথ্যা। হারমোনিয়াম্ বাজার ভাল-মন্দ সে বোঝে না। বলিল, 'সেরে আসুক আগে, তারপর তোমার যত-খুশী বাজিও!'

যোগীন জিজ্ঞাসা করিল, 'নায়েব-মশাই তোমাদের কবে কলকাতা যাবে জানো কিছু?'

মল্লিকা বলিল, 'না।'

যোগীন বলিল, 'কাল একবার জিজ্ঞেস্ কোরো ত'! যাবার সময় আমার সঙ্গে যেন দেখা করে' যায়—

হারমোনিয়াম্‌টা সারতে দেবো, আর একটা পিক্‌লু বাঁশীর দাম জেনে আসবে।'

মল্লিকা বলিল, 'কেন, তুমি জিজ্ঞাসা করতেও ত' পারো। আমার বাপু লজ্জা করে।'

যোগীন বলিল, 'লজ্জা? আ হা হাহা লজ্জাবতী লতা গো—!'

মল্লিকা দেখিল, আর খানিকক্ষণ থাকিলেই যোগীন হয়ত বাড়াবাড়ি সুরু করিবে, তাই সে 'আসি' বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন মল্লিকার শরীরটা ভাল ছিল না, দুপুর হইতে মাথা ধরিয়াছে, সন্ধ্যায় সৌদামিনী তাহাকে চারটি খাওয়াইয়া দিয়া, মাথাটা তাহার কোলের উপর রাখিয়া টিপিয়া দিতে দিতে বলিল, 'আজ আর ও-ঘরে গিয়ে কাজ নেই মল্লিকা, তুই আমার কাছে শো।'

মল্লিকা কোনও কথা বলিল না, লজ্জায় চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

শেষ পর্য্যন্ত হইলও তাহাই। মল্লিকাকে সৌদামিনী সেদিন আর যোগীনের কাছে যাইতে দিল না।

কিন্তু এম্‌নি মজা, সৌদামিনী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ঘুম ভাঙিতেই অন্ধকারে হাত্‌ড়াইয়া দেখে, মল্লিকা নাই। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আলো জ্বালিয়া তৎক্ষণাৎ সে এদিক্‌-ওদিক খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ঝি সুখদাকে উঠাইয়া বলিল, 'ছাখ্‌ মা, মল্লিকা কোথায় গেল ছাখ্‌!'

সুখদা বলিল, 'যাও মা ঘুমোও গে যাও!'

কথাটা সৌদামিনী বুঝিতে পারিল না। বলিল, 'কেন বল্‌ দেখি?'

সুখদা বলিল, 'জামাইএর কাছে গেছে, তুমি অমন করছ কেন মা?'

সৌদামিনী বলিল, 'শরীরটা যে ওর আজ বড্ডো খারাপ করেছে মা, মাথা ধরেছে বলছিল।'

সুখদা বুঝাইয়া বলিল, 'তুমি অমন কোরো না মা, মেয়ে তোমার মনে-মনে রাগে।'

সৌদামিনী চুপ করিয়া কি যেন ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, 'তা ত' বুঝি বাছা, কিন্তু আমার বড় ভয় করে। জামাইটে বদ্‌-রাগী, তার ওপর মেয়ের আমার শরীরটে বড় খারাপ। ওইটিই এখন পুঁজি বাছা, কি ভয় যে আমার হয়, তা তোরা বুঝবি কেমন করে?'

এই বলিয়া সুখদাকে আর বিরক্ত না করিয়া সৌদামিনী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। লণ্ঠনটা নিবাইয়া দিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়াও পড়িল, কিন্তু ঘুম তাহার কিছুতেই আসিল না। হঠাৎ এক সময় দেখা গেল, অন্ধকারে পা টিপিয়া টিপিয়া সে তাহার মেয়ে-জামাইএর ঘরের কাছে জানালার পাশটিতে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

জানালায় কোথাও কোনও ছিদ্রপথে কিছু দেখা যায় কি না সৌদামিনী ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেক রকম করিয়া প্রথমে তাহাই দেখিবার চেষ্টা করিল। দেখিল সে সুযোগ কোথাও নাই। তবে, মনে হইল যেন ভিতরে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন চলিতেছে। মল্লিকার উপর সৌদামিনীর রাগ হইল। এমন করিয়া রাত্রি

জাগিলে মানুষের অসুখ করিবে না ত' কি ! জামাইটা গোঁয়ারের একশেষ,—দেখিতেছে, মল্লিকার অসুখ, তবু তাহাকে অনর্থক বক্ বক্ করিয়া রাত্রি জাগাইয়া কি লাভ !

হঠাৎ তাহাদের কথাবার্ত্তার সুর যেন চড়িয়া উঠিল। বাহির হইতেই স্পষ্ট প্রত্যেকটি কথা শোনা যায়। সৌদামিনী কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল।

মল্লিকা বলিতেছে, 'হারমোনিয়াম্ সারতে তোমার কত লাগ্বে শুনি ?'

যোগীন বলিল, 'না তোমার আর শুনে কাজ নেই। অমন কথা যখন বলতে পার...'

'তবু শুনিই না !'

'তা দশ্-পনেরো টাকা।'

'আর টিক্লু বাঁশী না কি বললে ?

'হ্যাঁ, টিক্লু নয়—পিক্লু, পি—ক্লু।'

মল্লিকা জিজ্ঞাসা করিল, 'তার দাম ?'

'ঠিক জানি না, তা—আন্দাজ সত্তোর-আশী টাকা হবে।'

মল্লিকা বলিল, 'তাহ'লে ফের্ আর-একশ'।—কেমন ?'

যোগীন কি বলিল শোনা গেল না। বোধকরি ঘাড় নাড়িয়া হ্যাঁ বলিয়াছে।

মল্লিকা একটুখানি থামিয়া জবাব দিল।—'টাকা আমি এবার নিজে চাইতে ত' পারবই না, তুমিও যদি চাও ত' আমার মাথা খাও।'

যোগীন রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'বটে! তাহ'লে ও-সব আমার হবে না? অত দূর থেকে ঘাড়ে করে' নিয়ে এলাম হারমোনিয়াম্‌টা...'

মল্লিকা বলিল, 'আনতে কে বলেছিল তোমায়? না আনলেই পারতে!'

যোগীন বলিল, 'ভারি যে ট্যাক্ ট্যাক্ করে' কথা বলতে শিখেছ দেখ্‌ছি।'

মল্লিকা বলিল, 'হ্যাঁ শিখেছি, সেই কথাই বলতে এসেছিলাম, নহিলে আজ আর আসতাম না তোমার কাছে।'

যোগীন বলিল, 'আহ্লাদে' মেয়ের ভারি যে দেমাগ্ হয়েছে দেখি !'

মল্লিকা বলিল, 'হ্যাঁ, হয়েছেই ত'! তাই বলে' বার-বার টাকা তোমার জন্যে আমি চাইতে পারব না বাপু।'

যোগীন বলিয়া উঠিল, 'পারবে না ত' বেরোও এখান থেকে, বেরোও বলছি ! আমিও কাল চলে' যাব, আর কখ্খনো আসব না।'

মল্লিকা চুপ !

সৌদামিনী ভাবিয়াছিল, রাগিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিবে নিশ্চয়ই, কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া দেখিল, সে আসেও না, কথাও বলে না। অথচ ব্যাপারটা যে কি সেখান হইতে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। এত দিনের পুরানো জানালার কপাট,—এতটুকু একটা ফুটাও ত' থাকা উচিত।

শেষে কি আর করিবে, অন্ধকারে কানের কাছে মশা ভন্ ভন্ করিতেছিল, রাত্রি অনেক, ঘুমও পাইয়াছে, অমন করিয়া চোরের মত কতক্ষণই বা দাঁড়াইয়া

থাকে,—সৌদামিনী ধীরে-ধীরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া আবার তাহার নিজের বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

মল্লিকার কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন্ সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল জানে না, প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখে, মল্লিকা ঠিক তাহার পাশে, সন্ধ্যায় যেমন করিয়া ঘুমাইয়াছিল, তখনও ঠিক তেম্নি করিয়া ঘুমাইতেছে। মনে-মনেই ঈষৎ হাসিয়া মেয়ের গায়ের কাপড়টা ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া ঠাকুরদের নাম করিতে করিতে সৌদামিনী শয্যাত্যাগ করিল।

সকালে জামাইকে চা দিতে গিয়া সুখদা-ঝি চায়ের বাটি হাতে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

চা পাঠাইয়া দিয়াই সৌদামিনী কাপড় কাচিতে গিয়াছিল, মল্লিকা তখন সবেমাত্র বিছানা ছাড়িয়া চাবি-বাঁধা কাপড়ের আঁচলটা মেঝের উপর দিয়া টানিতে টানিতে ঘর হইতে বাহির হইতেছে, সুখদা জিজ্ঞাসা করিল, 'জামাই কোথা গেল মল্লিকা?'

ধরা-ধরা গলায় মল্লিকা জবাব দিল, 'তা আমি কি জানি !'

বলিয়াই সে কাপড়টা তাহার ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া চোখে-মুখে জল না দিয়াই এক-পা এক-পা করিয়া আগাইতে আগাইতে যোগীন যে-ঘরে শুইয়াছিল, সেই ঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। উঁকি মারিয়া দেখিল, ঘরে কেহই নাই। তাহার পর ঘরে ঢুকিয়াই প্রথমে দেওয়ালের ব্র্যাকেট্‌টার দিকে তাকাইয়া দেখে তাহার জামা নাই, জুতা যেখানে থাকে, দেখিল সেখানে জুতা নাই; এদিক-ওদিক তাকাইয়া, খাটের নীচে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া, দেওয়ালের গায়ে লাগানো বড় আলমারিটা খুলিয়া ভাঙ্গা হারমোনিয়াম্‌টারও কোনও সন্ধান করিতে পারিল না। বুকের ভিতরটা তাহার ধ্বক্ করিয়া উঠিল। তবে কি সত্যই সে রাগ করিয়া চলিয়া গেছে? চোখ দুইটা তাহার তৎক্ষণাৎ জলে ভরিয়া আসিল। কয়েক্ ফোঁটা অশ্রু তাহার হাতের উপর দিয়া গড়াইয়া বিছানায় পড়িল। ভাবিল,—যাক্, আবার আসিবে। ভাবিয়া সে তাহার আঁচল দিয়া

ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবে, সহসা তাহার চোখে পড়িল, সুমুখের সাদা ধপধপে দেওয়ালের উপর বড় বড় অক্ষরে পেন্সিল দিয়া লেখা—'তোমার নিকুচি করেছে। আমি চললাম। আর আসছি না বাবা।'

মল্লিকা তাড়াতাড়ি তাহার কাপড় দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া দেওয়ালের দাগ উঠাইতে লাগিল।

পেন্সিলের দাগ তখনও সম্পূর্ণ মুছে নাই এমন সময় দরজায় তাহার মা আসিয়া ডাকিল, 'মল্লিকা!'

আচম্‌কা মল্লিকা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, 'কি ?'

'জামাই কোথায় রে ?'

মল্লিকার মুখ দিয়া সহজে কথা বাহির হইতেছিল না। ধীরে-ধীরে বলিল, 'চলে' গেছে।'

'যাক্-গে, আয়।' বলিয়া সৌদামিনী তাহাকে একরকম জোর করিয়াই সে-ঘর হইতে বাহিরে টানিয়া আনিল।

যোগীনের রাগ বোধ হয় আর ভাঙ্গে না।

এক মাস যায়, দু'মাস যায়, তিন মাসও পার হইতে চলিল, যোগীনের আসিবার নাম নাই।

মল্লিকা চিঠি দেয়, কিন্তু জবাব আসে না।

তিনমাস পর্য্যন্ত কোনো রকমে সে ধৈর্য্য ধরিয়া ছিল, এবার ধীরে-ধীরে তাহার ধৈর্য্যের মাত্রা অতিক্রম করিতেছে।

মা তাহাকে কত রকম করিয়া বুঝায়। বলে, 'আমার মত অদৃষ্ট যেন আমার কোনও শত্রুরও না হয় মা! একটা ছেলে ছিল সেও গেল, একটা মাত্র মেয়ে—তাকেও যে কোনো রকমে সুখে রাখব তারও উপায় নেই।'

মল্লিকা আজকাল ভাল করিয়া খায় না, সাজ-সজ্জা এক রকম পরিত্যাগ করিয়াছে, একা থাকিলেই পড়িয়া পড়িয়া কাঁদে।

মায়ের মন,—জামাইএর উপর যতই বিরূপ হোক্, শেষ পর্য্যন্ত মেয়ের কষ্ট দেখিয়া তাহাকে একটা-কিছু করিতেই হয়।

অবিনাশবাবু একখানা চিঠি লিখিয়া সঙ্গে কিছু আম, সন্দেশ দিয়া জামাইএর বাড়ী লোক পাঠাইয়া দিলেন।

পরের দিন লোক ফিরিয়া আসিল। বুড়া রসিকলালের চিঠিখানি সৌদামিনীর হাতে দিয়া বলিল, 'পড়ে দেখুন।'

চিঠিখানি সৌদামিনী মল্লিকার হাতে দিয়া বলিল, 'পড়্ ত' মা, শুনি কি লিখেছে।'

অন্য সময় হইলে চিঠি সে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিত, কিন্তু এখন আর সে অবস্থা তাহার নয়। চিঠিখানি সে মনে-মনেই পড়িয়া বলিল, 'বুড়োর চিঠি।'

সৌদামিনী বলিল, 'দাদা-শ্বশুরের? কি লিখেছে শুনি!'

'তুমিই পড় না মা!' বলিয়া মল্লিকা কহিল, 'কানা বুড়ো নিজে ত' লিখতে পারেনি, কাকে দিয়ে লিখিয়েছে। লিখেছে, উনি বাড়ী নেই। কল্‌কাতার কোন্ একটা যাত্রার দলে গিয়ে ঢুকেছে। তাদের সঙ্গে বক্তৃতা করে' করে' ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। মাঝে একবার

এসেছিল। এবার এলে তাকে এখানে পাঠিয়ে দেবে লিখেছে।'

সৌদামিনী বলিল, 'ছি, ছি, ছ্যাখ্ দেখি মা জামাই-এর কাণ্ড! যাত্রার দলটা যদি এই দিক পানে কোথাও বায়না-টায়না নিয়ে আসে! লোকে বলবে ত'—অমুক বাবুর জামই!'

এবার মল্লিকার রাগ হইল। বলিল, 'কেন মা, ও-কথা কেন বলচ? এতই যদি লজ্জার ভয় ত' তোমাদের মুখ যাতে না পুড়ে তার ব্যবস্থা ত' করে' দিলেই পার।'

এমন কথা মল্লিকা কোনোদিন বলে না। আজ যে কেন বলিল কে জানে।

সৌদামিনী সেই কথাটাই সারাদিন ধরিয়া ভাবিতে ভাবিতে সেদিন সন্ধ্যায় মল্লিকাকে কাছে ডাকিয়া আদর করিয়া বলিল, 'সেজন্যে তুই দুঃখু করিস্‌নে মল্লিকা, তোর বাবাকে ব'লে সে-ব্যবস্থা আমি করে' দেবো দেখিস্।'

অথচ এতদিন ধরিয়া মুখে না বলুক, মনে-মনে মল্লিকা ঠিক ভাবিয়া রাখিয়াছে যে, বাপের বিষয়-সম্পত্তি

এখন সবই তাহার। সংসারে বাজে-খরচ হইলে মল্লিকার রাগ হয়, এক-একদিন ইচ্ছা করে, জমিদারী সেরেস্তায় দু'একজন মাত্র ভালো লোক রাখিয়া বাকি সব অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারীগুলাকে ছাড়াইয়া দিয়া খরচ কমাইয়া দেয়, মনে হয়, বাড়ীতে মাত্র তিনজন লোকের জন্য পাঁচজন দাসী-চাকরের কোনও প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আজ হঠাৎ তাহার মা তাহাকে এমন কথা বলিল কেন? বাবাকে বলিয়া তাহার একটা-কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিবার অর্থ সে ঠিক বুঝিতে পারিল না।

কথাটা সেইদিন হইতে মল্লিকার বুকের মধ্যে কেমন যেন সদা-সর্ব্বদাই কাঁটার মত খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতে লাগিল।

কিন্তু সে আর কতদিন!

যোগীনের না-আসার দুঃখটাই তাহার কাছে দিনে-দিনে এত বড় হইয়া উঠিল যে, সে-দুঃখটা তাহার আর মনেই রহিল না।

মাসের পর মাস পার হইয়া যায়—

যোগীন আর আসে না।

মল্লিকার ইচ্ছা, আর-একবার সেখানে লোক পাঠায়, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সেকথা কাহাকেও বলিতে তাহার লজ্জা করে।

এম্‌নি যখন তাহার মনের অবস্থা, তখন, একদিন সে হঠাৎ একটা বড় গোপনীয় তথ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

আবিষ্কার করিল, সৌদামিনী সন্তান-সম্ভবা!

মা'ও আর সে-কথা মেয়ের কাছে গোপন রাখিতে পারিল না।

মল্লিকা তাহার দু'চোখ বুজিয়া মাথা হেঁট্‌ করিয়া ভাবিতে বসিল। ভাবিল—ছেলে হয়ত' তাহার নাও হইতে পারে, হয়ত-বা তাহার একটি বোন হইবে।...

* *

*

৫

যাত্রার দলের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহুদিন পরে যোগীন বাড়ী ফিরিল—ম্যালেরিয়া ধরাইয়া। অমন জোয়ান চেহারা তাহার মাসখানেক্ জ্বরে ভুগিয়াই কঙ্কালসার হইয়া গেছে।

কামিনী বলিল, 'আচ্ছা হয়েছে! আর যাবি যাত্রার দলে?'

যোগীন বলিল, 'যাব বেশ করব, তোর কি?'

বৃদ্ধ রসিকলাল তাহাকে কাছে ডাকিয়া বুঝাইতে লাগিল, বলিল, 'ওরে গর্দ্দভ, আমি না তোকে এখন রাগ করতে বারণ করেছিলাম!'

যোগীন বলিল, 'না, করবে না! শ্বশুর-শাশুড়ী কবে মরবে তার ঠিক নেই, তার পর বিষয়-সম্পত্তি পাব কি পাব না, তার জন্যে এখন থেকে আমি ওদের 'চন্নামেত্ত' খাই! মাইরি আর-কি! না খেলেই নয়!'

বৃদ্ধ হিসাবী মানুষ; বলিল, 'না রে দাদাভাই মাথা গরম করিস্‌নে। বিষয়-সম্পত্তি সামান্য জিনিস নয়, এককাঠা জমির জন্যে কত লোক জীবন দিয়ে দেয়—তা জানিস? আমার কথা শোন্‌! অনেকদিন যাস্‌নি, শ্বশুর-শাশুড়ী ভেবে ভেবে খুন হচ্ছে। তুই একবার যা। আর…অমনি পারিস্‌ ত' কথায়-কথায় রায়েদের পুকুরের কথাটা পেড়ে দেখিস্‌। শাশুড়ীর কাছে, বুঝলি? আর, কারও কাছে নয়। আমি তোকে হদিস্‌ শিখিয়ে দিচ্ছি।'

অনেকদিন সে মল্লিকাকে দেখে নাই, নিমরাজি সে হইয়াই ছিল, তাহার উপর বৃদ্ধ রসিকলালের বচন; অবশেষে রাগ-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুরবাড়ী যাইবার জন্য রাজি তাহাকে একদিন হইতেই হইল।

যোগীন 'আজ যাই' 'কাল যাই' করিতেছে, এমন দিনে মল্লিকার এক চিঠি আসিয়া উপস্থিত!

চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতেই তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। আর-একবার ভাল করিয়া পড়িল। তাহার

পর আর-একবার !···বৃদ্ধ রসিকলালের কাছে গিয়া বলিল, 'এই ছাখো, কি সর্ব্বনাশ হয়েছে শোনো !'

রসিকলাল বলিল, 'সর্ব্বনাশ কিসের যোগীন ? কার সর্ব্বনাশ ?'

যোগীন বলিল, 'কার আবার ! বৌএর চিঠি এলো। শাশুড়ীর আবার একটা ছেলে হয়েছে।'

কথাটা শুনিয়াও রসিকলাল বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, 'ছাখ্ আবার, কার চিঠি বলে' কার চিঠি খুলেছিস্ হয়ত'। লেখাপড়া ত' আর তেমন শিখ্‌লিনে হতভাগা ; ছাখ্ আবার, কি পড়্‌তে কি পড়লি ছাখ্।'

যোগীন ভেংচি কাটিয়া বলিল, 'তোমার মাথা ! বল্‌ছি মাসখানেক্ আগে শাশুড়ীর একটি ছেলে হয়েছে, তা বুঝি বিশ্বেস্ হচ্ছে না ?'

রসিকলাল কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একটা হাই তুলিয়া হাতের দুই আঙুলে চুট্‌কি দিতে দিতে বলিল, 'মায়া, মায়া, সবই মায়া ! সবই পরীক্ষা ! তা হোক্, তুই যা। গিয়ে বলবি,

বৌকে নিতে এলাম। অনেকদিন যায়নি, ঠাকুদ্দার বড় কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এই আমি বলে' রাখছি যোগীন, এ-ছেলেও টিঁক্‌বে না। তখন বলিস্‌ যে, হ্যাঁ, বুড়ো বলেছিল।'

বলিয়াই বুড়া একটা বড়-রকমের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হেঁটমুখে কি যেন ভাবিতে লাগিল।

বলিল, 'তা হোক্‌। তুই ভাবিস্‌নি যোগীন, যেমন করে' পারিস্‌ বৌকে নিয়ে আসবি, তারপর আমি দেখে' নেবো।'

রাধানগর যাইতে যোগীনের দু'-চারদিন দেরি হইল।

গিয়া দেখে, জমিদার-বাড়ীতে আনন্দের ঘটা পড়িয়া গেছে। ইহারই কিছুদিন পূর্ব্বে যে এই বাড়ীতেই, একদিন একটা শোকাচ্ছন্ন ভয়াবহ অন্ধকার নিবিড়ভাবে ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, সে-কথা এখন আর কাহারও মনে নাই।

আহারাদির পর একটুখানি রাত্রি করিয়াই মল্লিকা যোগীনের সঙ্গে দেখা করিল।

যোগীন চুপ করিয়া খাটের উপর বসিয়া বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল। মল্লিকা ঘরে ঢুকিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া তাহার কাছে গিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

যোগীন কথা কিছুতেই কয় না, ভাবিল, মল্লিকাই আগে কথা কহিবে।

কিন্তু মল্লিকার কান্না যখন আর কিছুতেই থামে না, যোগীন তখন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওগো থামো, থামো, জানি, সব জানি। তুমি এক কাজ কর, তার চেয়ে নিয়ে এসো কাল একবার ছেলেটাকে আমার কাছে। দিই টুঁটি টিপে মেরে'। তারপর মরা ছেলেটাকে তেম্‌নি শুইয়ে দিয়ে আস্‌বে ধীরে-ধীরে। কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। বুঝ্‌লে ?'

যেই কথাটা বলা, জানালার বাহিরে ধুপ্‌ করিয়া একটা শব্দ শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, কে যেন অস্পষ্টভাবে গোঙানি সুরু করিয়াছে।

ব্যাপারটা কি, দেখিবার জন্য যোগীন ও মল্লিকা দু'জনেই লণ্ঠন হাতে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

আসিয়াই দেখে, সৌদামিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া জানালার কাছে পড়িয়া আছে।

ইহার কারণ আর বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। সে যে স্বকর্ণে সমস্ত শুনিয়াছে, তাহাতে কোনও সংশয় নাই। যোগীন মাথা হেঁট করিয়া পুনরায় ঘরে গিয়া ঢুকিল, মল্লিকা তাহার হাতের লণ্ঠনটা সেইখানেই নামাইয়া দিয়া 'মা' 'মা' বলিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া দাসী চাকরকে ডাকিয়া লোক জড়ো করিয়া বাড়ীতে তৎক্ষণাৎ একটা হৈ চৈ বাধাইয়া তুলিল।

কি একটা মোকর্দ্দমার জন্য অবিনাশবাবু শহরে গিয়াছিলেন তাই রক্ষা।

সুখদা বহুকালের পুরাণো ঝি; সে-ই তাড়াতাড়ি জল আনিয়া সৌদামিনীর চোখে-মুখে ঝাপ্‌টা দিয়া তাহার জ্ঞান সঞ্চার করিল এবং নিজেই তাহাকে সেখান

হইতে উঠাইয়া হাতে ধরিয়া ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া শোয়াইয়া দিল।

মল্লিকা তাহার শিয়রের কাছে গিয়া ডাকিল, 'মা!'

কথা বলা দূরে থাক্, মা একবার সেদিক পানে ফিরিয়াও তাকাইল না। তৎক্ষণাৎ পাশ ফিরিয়া সে তাহার নবজাত শিশুপুত্রটিকে হাত বাড়াইয়া আগ্‌লাইয়া ধরিয়া চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

মল্লিকা তখন তাহার উদ্‌গত অশ্রুর ধারা আঁচল দিয়া মুছিতে মুছিতে ধীর পদক্ষেপে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে, দেখা গেল, লজ্জায় কাহাকেও কিছু না [illegible] যোগীন সেখান হইতে পলায়ন করিয়াছে।

বাড়ীর চারিদিকে কেমন যেন একটা ভয়াবহ স্তব্ধতা! যে মল্লিকার সুখ-সুবিধা আদর-যত্নের জন্য আঁতুড়-ঘরেও সৌদামিনীর স্বস্তি ছিল না, সেই সৌদামিনীই আজ নীরব!

মল্লিকা কতবার কত রকম করিয়া মাকে তাহার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে যে, ইহাতে দোষ তাহার বিন্দুমাত্রও নাই এবং তাহার স্বামীও যে অপরাধী তাহাও নয়। কথাটা সে বলিয়াছিল মাত্র হাসি-রহস্য করিয়া।

কিন্তু সৌদামিনী বোধহয় সে-কথা বিশ্বাস করে নাই। বলিয়াছে, 'হ্যাঁ লো হ্যাঁ আমি জানি, তুই চুপ কর্।'

তাহার পর মল্লিকার সঙ্গে সে যে একেবারেই কথা কয় নাই তাহা নয়, স্নানের সময় স্নান করিতে বলিয়াছে, খাইবার সময় খাইতে ডাকিয়াছে, দু'একটা অন্য কথাও হয়ত' কহিয়াছে, কিন্তু সবই যেন কি রকম করিয়া।

অথচ মল্লিকা নির্দোষ।

সে আর কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলে না। মুখ ভার করিয়া একাকিনী চুপ করিয়া বসিয়া

থাকে। মা'র কাছে বড়-একটা যায় না। যোগীন সেদিন যে-জায়গাটায় বসিয়া নবজাত শিশুটিকে হত্যা করিবার কথাটা বলিয়াছিল, সেইখানে গিয়া সে খাটের গায়ে ঠাই ঠাই করিয়া মাথা ঠোকে, তাহার পর মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে স্বরু করে।

সে-কান্না কেহই তাহার থামাইতে আসে না; নিজেই শেষে এক সময় উঠিয়া বসে, ভাবে, তাহার প্রতি সৌদামিনীর এই যে ভাবান্তর, যোগীনের ওই একটি মাত্র কথাই হয়ত তাহার যথেষ্ট কারণ নয়। ভাবে হয়ত ওই ভবিষ্যৎ বংশধরটি জন্মাইবার পর হইতেই মা'র মনে তাহার প্রতি বিরাগের সঞ্চার হইয়াছে। তাহার স্বামীর মুখের ওই দুষ্ট কথাটা ছুতা মাত্র।

যে-মেয়ের আদর-সোহাগের একদিন সীমা ছিল না, সেই মল্লিকাই আজ সৌদামিনীর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে—একেবারে দু'-চক্ষের বিষ!

দাসী-চাকরেরা ভিতরের ব্যাপার কিছু জানে না। তাহারা অবাক হইয়া শুধু দেখে আর ভাবে—জগতে ইহাও সম্ভব।

সৌদামিনীর শিশু-পুত্রের নাম রাখা হইয়াছে—টুকুন্।

টুকুন্ ওই অতটুকু ছেলে; মাথায় এক-মাথা কালো কালো চুল, গায়ের রং ফর্সা, চোখ দুইটি বড়, মুখের চেহারা দেখিতে অনেকটা মল্লিকারই মত। মানুষ দেখিলেই সে তাহার কচিকচি হাত-পাগুলি ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসে। হাসিবার সময় দুই গালে দুটি টোল্ পড়ে, দেখিলেই কোলে লইয়া চুমা খাইয়া আদর করিতে ইচ্ছা করে।

মল্লিকা ভয়ে-ভয়ে সেই ঘরে গিয়া ঢোকে। ছেলেটার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আদর করিতে যায়, মা তাহার মুখখানা ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বলে, 'কেন ওকে বিরক্ত করছিস্ বাছা? ওর ঘুম পেয়েছে।'

বলিয়া সৌদামিনী তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া তাহার কচি শিশুর গায়ে-মাথায় থুপ্ থুপ্ করিয়া চাপ্‌ড়াইতে থাকে। বলে, 'আর হাসতে হয় না,—ঘুমো।'

ক্ষুণ্ণমনে মল্লিকা সেখান হইতে সরিয়া গিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু এমন করিয়া বেশি দিন চলে না।

মাস-দুইএর ভিতরেই কথাবার্ত্তা আবার সবই হয়।

মা ও মেয়ের গুমোট্ ভাবটা যেন কাটিয়া গেছে। সৌদামিনী আবার আগের মতই মেয়ের খাওয়া-দাওয়ার সুখ-সুবিধার খোঁজ-খবর সবই রাখে।

মল্লিকার ভারিভারি মুখ আবার যেন প্রসন্ন হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু হইলে কি হয়—

সৌদামিনী সেদিন সকালে বোধকরি খিড়্‌কির বাঁধানো পুকুরে কাপড় কাচিতে গিয়াছিল। টুকুন্ হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল।

কাঁদিয়া উঠিতেই মল্লিকা ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া টুকুন্‌কে তাড়াতাড়ি তাহার বিছানা হইতে দুইহাত দিয়া

বুকে তুলিয়া লইয়া আদর করিয়া চুমা খাইয়া তাহার কান্না চুপ করাইবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় ভিজা কাপড়েই ছুটিতে ছুটিতে সৌদামিনী আসিয়া হাজির!

আসিয়াই আর কোনও কথা নাই বার্ত্তা নাই, মল্লিকার কোল হইতে টুকুন্‌কে একেবারে ছিনাইয়া কাড়িয়া লইয়া সৌদামিনী বলিল, 'থাক্।'

বলিয়া ক্রন্দনরত ছেলেটাকে সে আবার তাহার বিছানার উপর শোয়াইয়া দিয়া কাপড় ছাড়িতে লাগিল।

মল্লিকার দুঃখ হইবারই কথা। দুর্দ্দমনীয় ক্রন্দনের বেগ তখন তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিয়াছে। লজ্জায় মাথা হেঁট্ করিয়া ঘর হইতে সে বাহির হইয়া গেল এবং নিজের ঘরে গিয়া আপন মনেই ফুলিয়া ফুলিয়া খানিক্‌টা কাঁদিয়া সে তাহার স্বামীকে চিঠি লিখিতে বসিল।

—বোকার মত কি কাণ্ড যে করিয়া গেলে। আমি তাহার ফলভোগ করিতেছি। লজ্জা না করিয়া শীঘ্র এখানে

আসিয়া আমাকে লইয়া যাও। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আর আমার উপর রাগ করিও না।—

* * * *

কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতা সহসা একদিন নিজের হাতে সব যেন ভাঙিয়া-চুরিয়া তছ্‌নাছ্‌ করিয়া দিলেন !

স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় মল্লিকা এদিকে পথ চাহিয়া বসিয়া আছে, ওদিকে রাধানগরের জমিদারীর উপর বৃদ্ধ রসিকলালের লোভ !

অবিনাশবাবু সেদিন তাঁহার কাছারী-বাড়ীতে বসিয়া আছেন, এমন সময় কোথা হইতে একটি লোক আসিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া একটি প্রণাম করিয়া একখানি চিঠি তাঁহার পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিল, 'ভারী জরুরী চিঠি বাবু।'

চিঠিখানি খুলিয়া অবিনাশবাবু দেখিলেন, সম্পূর্ণ অপরিচিত হস্তাক্ষর। প্রায় ক্রোশ-পাঁচেক্ দূরের

বৈনাচিতি গ্রাম হইতে চিঠিখানি আসিয়াছে। ভদ্রলোক লিখিয়াছেন—

যথাযোগ্য অভিবাদনান্তে নিবেদনমেতৎ—

আমাদের গ্রাম্য বারোয়ারী উৎসব উপলক্ষে পূর্ব্ব-অঞ্চল হইতে একদল যাত্রাগানওয়ালাদিগকে আনা হয়। গতকল্য রাত্রি হইতে তাহাদের দলের এক ব্যক্তি হঠাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। ব্যক্তিটির নিকট বিশেষ সংবাদ লইয়া অবগত হইলাম, আপনার কন্যাকে সে-ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছে, আপনি তাঁহার শ্বশুর। অতএব মহাশয় যদি এবম্প্রকারই হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি নিজে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক সমভিব্যাহারে ত্বরায় আমাদের গ্রামে আগমন করিয়া তাঁহার নিরাময়ের ব্যবস্থা করুন। আমরা গ্রামবাসীরা আমাদের যথাসাধ্য করিতেছি। জ্ঞাতার্থে নিবেদনমিতি।

বশংবদ

শ্রীজনার্দ্দন দেবশর্ম্মাঃ

চিঠির কথা অবিনাশবাবু কাহাকেও জানাইলেন না। নায়েবকে ডাকিয়া বলিলেন, 'চল, আমার সঙ্গে তোমায় যেতে হবে। সঙ্গে শ'খানেক্ টাকা নাও।'

বেনাচিতি যাইতে হইলে ট্রেণে চড়িয়া যাইতে হয়। যাইবার পথে গঞ্জে নামিয়া ভাল একজন ডাক্তার সঙ্গে লইয়া বেনাচিতি গ্রামে যখন তাঁহারা উপস্থিত হইলেন, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

নিস্তব্ধ পল্লীগ্রামের অন্ধকার পথ। সঙ্গের লোকটি পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। বারোয়ারী-তলায় প্রতিমার সুমুখে টিম্ টিম্ করিয়া একটি আলো জ্বলিতেছে। যাত্রার জন্য প্রাঙ্গণের উপর প্রকাণ্ড একটা সামিয়ানা টাঙানো হইয়াছিল। সামিয়ানাটা এখনও তেম্‌নি টাঙানোই রহিয়াছে; লাল নীল নানারঙের কাগজের তৈরী শিকলিগুলা গ্রামের ছেলেরা বোধকরি টানিয়া ছিঁড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছে। সামিয়ানার নীচে গ্রাম্য কয়েকটা কুকুর ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সুমুখে এতগুলা লোক দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একটা একবার একটুখানি খেউ খেউ করিয়া চীৎকার করিবার চেষ্টা করিয়াই লেজ গুটাইয়া সরিয়া গেল। বারে-বারে পিছন ফিরিয়া তাকাইতে তাকাইতে কয়েকটা কুকুর ছুটিয়া পলায়ন করিল।

বাকি যাহারা শুইয়া ছিল, নিতান্ত নির্বিকারচিত্তে মুখ তুলিয়া একবার তাকাইয়া দেখিয়াই আবার তাহারা তেম্‌নি মুখ গুঁজিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়াই রহিল।

কিছু দূরে বহুদিনের পুরাতন পোড়ো একটা ভিটের পাশে কয়েক্‌টা আলো দেখা যাইতেছিল। গ্রামের যে লোকটি তাঁহাদের আনিতে গিয়াছিল, আঙুল বাড়াইয়া সেইখানটা সে দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'ওইটে সাজ-ঘর। ওইখানেই আছে।'

দেখা গেল, জনকয়েক্‌ লোক লণ্ঠন লইয়া ভিটের মাঝখানে চক্রাকারে বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে। এতগুলি লোক দেখিয়া তাহারা প্রায় সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, 'গোবিন্দ, এলি ?' বলিয়াই সে এই আগন্তুক তিনজনের মুখের পানে তাকাইয়া ব্যথিতকণ্ঠে কহিল, 'বিকেল পর্য্যন্ত কোনো-রকমে রেখেছিলাম মশাই, তারপর আর পারা গেল না।'

বৃদ্ধ-গোছের মোটা-সোটা একজন লোক আগাইয়া আসিলেন, কাঁধে গামছা, গলায় যজ্ঞোপবীত ; বলিলেন,

'আমার চিঠিখানা তাহ'লে পেয়েছিলেন ঠিক। আমি ত' মশাই সেই থেকে আর বাড়ী ঢুকিনি, এইখানেই পড়ে' আছি চব্বিশ ঘণ্টা। কি আর করি বলুন, ব্যাটাদের এত করে' বললাম, 'তা হাজার-হোক্, তোদের দলেরই ত' একজন আসামী, বিপদে যখন পড়েছে বেচারা, তা অন্তত একজন থাক্!' বলিয়াই মুখখানা বিকৃত করিয়া ঘাড় নাড়িয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, 'কেউ থাকলো না! অধিকারী থেকে আরম্ভ করে' মায় সেই বাচ্চা রাধিকাটি পর্য্যন্ত প্রাণের ভয়ে সব পালালো। সাজের বাক্সগুলো এই একক্ষণে আমি গরুর গাড়ী করে' বিদেয় করে' দিলাম। বললাম, 'যা বেটারা!' আমরা ত' আর পালাতে পারিনে, বিশেষ করে' যখন শুনলাম গিয়ে···আমাদের রাধানগরের···তা আর এখন কেঁদে কি করবেন বলুন, নিয়তি, নিয়তি! যার যেখানে মাটি, তাকে সেইখানে···আসুন, ভেতরেই আসুন একবার। ওরে ও বিনোদ, আলোটা ধর্ বাবা ভাল করে'—'

দু'জন লণ্ঠন দেখাইয়া আগে আগে চলিল।

ঘরের চৌকাঠের কাছে কেরোসিনের একটা কুপি জ্বলিতেছিল। চারিদিকে ভ্যাপ্‌সা মাটি ও কাঁচা হলুদের একটা অস্বস্তিকর গন্ধ! শুক্‌নো কতকগুলো খড় ইতস্তত ছড়ানো। দরজার পাশেই মাটির একটা কলসি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে, আর তাহারই পাশে শুকনো খড়ের শয্যায় যোগীনের মৃতদেহ। দয়া করিয়া গায়ে একটা কাপড়ও কেহ ঢাকা দিয়া দেয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার যন্ত্রণার বোধকরি অবধি ছিল না। মুখখানা বিকৃত কিম্ভুতকিমাকার হইয়া উঠিয়াছে, হাতপা কাঠের মত সোজা! তাহার উপর সর্ব্বাঙ্গে হলুদের দাগ।

মল্লিকার কথা ভাবিয়া অবিনাশবাবুর চোখের জল আর কোন প্রকারেই বাধা মানিতেছিল না।

নায়েব-মশাই তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে বাহিরে আনিলেন।

সৎকারের ব্যবস্থা পূর্ব্বাহ্ণেই সব প্রস্তুত হইয়াই ছিল।

গ্রামপ্রান্তে শুষ্ক একটি ক্ষুদ্র নদীতীরে শ্মশান। প্রকাণ্ড একটি বটবৃক্ষের তলায় চিতা রচিত হইল এবং

সেইখানেই দাহকার্য্য সমাধা করিয়া, নায়েব-মহাশয় গ্রামের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে কাছে ডাকিয়া তাঁহার হাতে কিছু টাকা দিয়া বলিলেন, 'যা-কিছু করতে হয় আপনার ওপরেই ভার দিয়ে আমরা—'

কিন্তু তাহা নাকি হইবার নয়। সকলেই একসঙ্গে হৈ-চৈ করিয়া কথাটা তাঁহাকে শেষ করিতে দিল না। জনার্দ্দন শর্ম্মা টাকাগুলি তাঁহার কাপড়ের খুঁটে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিতে লাগিলেন, 'একে কাশরার রোগী, তার ওপর এখান থেকে ফিরে' গেলে যে গ্রামের অকল্যাণ হবে বাবা, একবারটি সকলে মিলে গ্রামে ঢুকে—বাস্, তারপর তোমরা চলে' যেয়ো।'

গ্রামে ফিরিয়া আর-এক বিপদ বাধিল। একে অজানা পথ, তাহার উপর ঘোর অন্ধকার রাত্রি, ষ্টেশন পর্য্যন্ত আলো লইয়া কেহই তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে চাহিল না, কাজেই বারোয়ারী-তলায় রাত্রি প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্মশানযাত্রী সকলকেই অপেক্ষা করিতে হইল।

পরদিন একেবারে অতর্কিতে অকস্মাৎ যে দুঃসংবাদ অবিনাশবাবু তাঁহার স্ত্রী-কন্যার কাছে বহন করিয়া আনিলেন, তাহা একেবারে নিদারুণ!

মেয়েকে জড়াইয়া ধরিয়া সৌদামিনী কাঁদিয়া আকুল হইল। মল্লিকার যে কি হইল সে-কথা আর বলিয়া কাজ নাই।

এ ধাক্কা সাম্‌লাইতে তাহাদের অনেক দিন লাগিল।

হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া, নোয়া ভাঙ্গিয়া, কপালের সিঁদুর মুছিয়া, সাদা থান্ পরিয়া, শুষ্ক ম্লান মুখে মল্লিকা ঘুরিয়া বেড়ায়। সৌদামিনী দেখে আর কাঁদে। কাহারও মুখে একটি কথা নাই! মনে হয়, এত বড় বাড়ীতে লোকজন কেহ যেন আর বাস করে না। শোকাচ্ছন্ন একটা নিস্তব্ধতায় দিবারাত্রি চারিদিক্ থম্ থম্ করিতে থাকে।

মল্লিকা কাহারও সঙ্গে একটি কথা বলে না, একটা কথা দু'বার বলিতে হইলেই ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলে, রাগিয়া কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে।

খাইবার সময় সৌদামিনী তাহাকে ডাকাডাকি করে, এক ডাকে আজকাল আর তাহার সাড়া পাইবার উপায় নাই, ডাকিয়া ডাকিয়া হায়রাণ হইয়া গেলে পর মল্লিকা হয় ত' মুখ তুলিয়া বলে, 'উঁ!'।

সৌদামিনী বলে, 'অমন করলে আর ক'দিন বাঁচবি বাছা?'

মল্লিকা বলে, 'নাই বা বাঁচলাম।'

সৌদামিনী আর দ্বিতীয় কথা মুখ দিয়া উচ্চারণ করে না। জানে, সে তাহা হইলে এখনই হয় ত' বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে বসিবে। ঘরে খিল্‌ বন্ধ করিয়া আর সহজে বাহির হইতে চাহিবে না।

সৌদামিনীর শিশু-পুত্রটিকে যোগীন একদিন হত্যা করিতে চাহিয়াছিল, সে-কথা আজ আর তাহার মনে

থাকিবার কথা নয়; কিন্তু তাহার ওই অত সাধের পুত্র-সন্তানটির অত বড় অমঙ্গলের কথাটা মনের মধ্যে তাহার এম্‌নি দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে সে ভুলিতে কিছুতেই পারে না। মল্লিকাকে সে তাহার টুকুনের কাছে দেখিলে এখনও আতঙ্কে চমকিয়া ওঠে।

অথচ মল্লিকার সে-কথা মনে কিছুতেই থাকে না।

ছেলেটা কাঁদিলে মল্লিকা তাহাকে কোলে করিতেও যায়, হাসিলে সে তাহার যন্ত্রণার কথা ভুলিয়া নিজেও একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করে।

মা সেদিন খাইতে বসিয়াছিল। খাওয়া শেষ হইলে ঘরে আসিয়া দেখে, টুকুনের শয্যা শূন্য, টুকুন নাই!

থাকো-ঝি বারান্দায় বসিয়া পান সাজিতেছিল, সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'ছেলে কোথায় রে থাকো?'

থাকো বলিল, 'দিদিমণি নিয়ে গেলেন হাঁস দেখাতে।'

সৌদামিনীর বুকের ভিতর ধ্বক্ করিয়া উঠিল। বলিল, 'কোথায় নিয়ে গেছে?'

'পুকুরের ঘাটে।'

সৌদামিনী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'নিয়ে আয় বাছা, যা দৌড়ে যা, যা বলছি, যা যা!'

বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া সৌদামিনী তাহার পিছু পিছু সিঁড়ির কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ছেলে লইয়া ঝি যতক্ষণ না ফিরিয়া আসিল ততক্ষণ তাহার স্বস্তি রহিল না।

ঝির কাছ হইতে হাসিয়া টুকুন্‌কে নিজের কোলে লইয়া চুমা খাইয়া সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'সে কি করছে রে?'

থাকো বলিল, 'কি আর করবে মা, কাঁদছে বসে বসে।'

'কেন, পুকুরের ঘাট ছাড়া কাঁদবার আর জায়গা হোলো না?'

বলিয়া সে উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া ছেলেকে আদর করিতে লাগিল।

ঘাট হইতে ফিরিয়াই মল্লিকা সেদিন কাঁদ-কাঁদ মুখে মার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'আমায় শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দাও মা!'

সৌদামিনীর মনের অবস্থা ভাল ছিল না। বেশ একটু রাগ করিয়াই বলিল, 'সেখানে কে আছে তোর যে, শ্বশুরবাড়ী যাবি?'

মল্লিকা তাহার কান্নাটা কোনোরকমে এতক্ষণ চাপিয়া ছিল, এইবার সে আবার কাঁদিয়া ফেলিয়া বেশ জোরে-জোরেই বলিল, 'যেই থাক্, সেইখানেই আমি যাব।'

'কেন?'

মল্লিকা বলিল, 'কেন? যাব না ত' কি এইখানে তোমাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে আমায় থাকতে হবে?'

সৌদামিনী অত্যন্ত রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'কে তোকে লাথি-ঝ্যাঁটা মারলে তা শুনি?'

ঠোঁটে ঠোঁটে একরকম শব্দ করিয়া মল্লিকা বলিল, 'শুনতে চাও? কেন, জান না?'

সৌদামিনী চুপ করিয়া রহিল।

মল্লিকা প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না না না, পারব না---পারব না তোমাদের কাছে থাকতে, ওই ছেলে যে বড় হ'য়ে আমায় লাথি-ঝাঁটা মারবে, আর আমি দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের জন্যে···না না তা হবে না, তা হবে না, আমায় পাঠিয়ে দাও।'

বলিয়া চোখে আঁচল চাপা দিয়া মল্লিকা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ছেলের কুথায় মা তখন রাগে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'ও, তাই বুঝি তুই এ-ছেলের গলা টিপে মারতে চেয়েছিলি? ও, তাই বুঝি তোরা দু'জনে ষড়যন্ত্র করে' টুকুন্‌কে আমার—'

মল্লিকার চোখ দিয়া তখনও দরদ্দুর্ করিয়া জল গড়াইতেছিল, ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ, চেয়েছিলাম। চেয়েছিলামই ত!'

বলিতে বলিতে গলাটা তাহার বন্ধ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া সেখান হইতে সে চলিয়া যাইতেছিল, দেখিল, পশ্চাতে তাহার বাবা আসিয়া

দাঁড়াইয়াছেন। সর্ব্বনাশ! লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া মল্লিকা একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়াই সেখান হইতে দ্রুতপদে পলায়ন করিল।

শুনিল, বাবা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'কি, হলো কি তোমাদের?'

মা বলিয়া উঠিল, 'ওগো, তাড়াও, তাড়াও, তোমার ওই শত্রুকে তাড়াও বাড়ী থেকে, নইলে তোমার এ ছেলেকে একদিন ও হিংসেয় খুন ক'রে ফেলবে।'

বলিয়া ছেলেকে তাহার বুকে চাপিয়া ধরিয়া সৌদামিনী কাঁদিতে লাগিল।

এবং এই সামান্য ব্যাপারের ফল দাঁড়াইল এই যে রাত্রে খাবার সময় ডাকিতে গিয়া মল্লিকাকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বাড়ী ছাড়িয়া কখন্ যে সে চলিয়া গিয়াছে কেহ দেখে নাই।

চারিদিকে খোঁজ্ খোঁজ্ পড়িয়া গেল।

সৌদামিনা সেই যে মেয়েকে তিরস্কার করিয়া ঝির কোলে ছেলে দিয়া মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে স্বরু করিয়াছিল, সে-কান্না তাহার তখনও থামে নাই। মল্লিকাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না শুনিয়াও সে তেমনি পড়িয়াই রহিল। মাত্র সুখদা-ঝিকে একবার কাছে ডাকিয়া বলিল, 'বাবুকে বল্।'

অবিনাশবাবু তাহার পূর্ব্বেই খবর পাইয়াছেন।

পাইয়া অবধি তাঁহার ছুটাছুটির আর বিরাম নাই। গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ী, প্রত্যেকটি স্থান, তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোথাও তাহাকে যখন পাওয়া গেল না, তিনি তখন জেলেদের ডাকিয়া পাঠাইলেন।— প্রত্যেকটি পুকুরে জাল ফেলিয়া দেখুক্, যে মনের দুঃখে জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে কি না!

কিন্তু কোনও পুকুরেই মল্লিকার মৃতদেহের সন্ধান মিলিল না।

তৎক্ষণাৎ লোক ছুটিল তাঁহার শ্বশুরবাড়ীতে।

সেখানেও নাই!

তবে সে গেল কোথায় ?

অবিনাশবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সৌদামিনী কাঁদিতে লাগিল।

কিন্তু একে জমিদারের বাড়ীর মেয়ে, তায় আবার বিধবা যুবতী।

মান গেল, মর্য্যাদা গেল, অথচ বেশি গোলমাল করিবার উপায় নাই।



গল্পের যবনিকা আমরা এইখানেই টানিয়া দিয়াছিলাম। বলিবার আর আছেই বা কি !

বাংলাদেশে মল্লিকা মেয়ে হইয়া জন্মিয়াছে। পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী সে নয়। লোভ করিয়া যেমন সে সেদিকে হাত বাড়াইয়াছিল, তেমনি উপযুক্ত শাস্তিই তাহার হইয়াছে। উহার জন্য দুঃখ করা আমাদের অন্যায়।

যাই হোক্, সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসর আমরা আর কাহারও কোনও সংবাদ রাখি নাই।

কুড়ি বৎসর পরে দেখা গেল, ছোট্ট একখানি গ্রামের প্রান্তে লাল কাঁকরের 'গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক্ রোডে'র পাশে একটা বটগাছের তলায় কালো রঙের একটি মোটরকার দাঁড়াইয়া আছে। কোথাকার কোন্ এক বাবু নাকি বন্দুক লইয়া পাখী শীকার করিতে আসিয়াছেন।

বন্দুকের শব্দ পাইয়া দলে দলে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা শীকারী দেখিতে যাইতেছিল। কাহারও বাপ-মা হয়ত' ছেলেমেয়েদের জোর করিয়া ধরিয়া রাখিলেন। —'খবরদার যাস্‌নে বলছি, একটা গুলি যদি ধাঁ করে' এসে' লাগে ত'—বাস্।'

কিন্তু কৌতূহলী ছেলের দলকে আট্‌কাইয়া রাখা দায়! দেখিতে দেখিতে গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গেল, —যিনি আসিয়াছেন, তিনি রাধানগরের জমিদারের ছেলে, কোট-প্যাণ্ট্-পরা সাহেবের মত চেহারা!

ছোট্ট গ্রামের ততোধিক ছোট এক জমিদারের

ছোট একটি ঠাকুর-বাড়ী। ঠাকুর-বাড়ীর পাশেই ঘাট-বাঁধানো পুকুর। পুকুরের পাড়ে বড় বড় অনেকগুলি তেঁতুলের গাছ।

হঠাৎ সেই তেঁতুলগাছের তলায় দুড়ুম্ করিয়া একবার বন্দুকের আওয়াজ হইল। ঠাকুরের ভোগ-মন্দিরে বিধবা যে-মেয়েটি রান্না করিতেছিল, সংবাদটা তাহারও কানে গিয়া পৌঁছিয়াছে; গুলির আওয়াজে চমকিয়া উঠিয়া মেয়েটি তৎক্ষণাৎ খিড়্‌কির দরজা খুলিয়া পুকুরের পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, চমৎকার একটি ছেলে, সাদা ধপ্‌ধপে সাহেবদের মত গায়ের রং, মাথায় টুপি, হাতে বন্দুক, উপরের দিকে তাকাইয়া তেঁতুলগাছের তলায় দাঁড়াইয়া আছে।

অতিকষ্টে বার-কতক্ ঢোক্ গিলিয়া এদিক-ওদিক্ তাকাইয়া মেয়েটি ডাকিল, 'টুকুন্!'

ডাকিবামাত্র অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে কণ্ঠ তাহার রুদ্ধ হইয়া গেল। চোখ দুইটি ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল।

কে ডাকিল বুঝিতে না পারিয়া ছেলেটি আচম্‌কা পিছন্ ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি ডাকছেন?'

মল্লিকা আর স্থির থাকিতে পারিল না। যে-মেয়ে আজ বিশ বৎসর বাড়ী হইতে পালাইয়া আসিয়াছে, সে-হতভাগীর পরিচয় দিয়া আর কাজ নাই।

হেঁটমুখে চোখের জল গোপন করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, 'না।...ডাকিনি।'

বলিয়াই সে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পিছন্ ফিরিয়া চলিয়া আসিল।

ডাক্-নাম ধরিয়া কে কোথায় তাহাকে পিছু ডাকিল তাহার সন্ধান লইবার মত অবসর তখন টুকুনের নাই। যে-পাখীর সন্ধানে সে এতদূর ছুটিয়া আসিল, সেই ঘুঘু আবার আকাশে উড়িয়াছে।...তাহারই সন্ধান করিতে করিতে সে বন্দুক হাতে লইয়া কয়েকটা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পুষ্করিণীর পাষাণ-চত্বরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মল্লিকা চোখ মোছে আর দেখে—আবার চোখের জল গড়াইয়া আসিয়া দৃষ্টি তাহার ঝাপ্সা করিয়া দেয়।

তবু দেখা যেন তাহার শেষই হয় না।

এদিকে বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া খিড়কির দরজায় তখন পাড়ার দু'জন, বর্ষীয়সী মহিলা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মল্লিকা ফিরিয়া আসিতেছিল, একজন বলিল, 'কি লা, সায়েব দেখতে গিয়েছিলি নাকি? ইদিকে তরকারি যে তোর পুড়ে গেল।'

মল্লিকা বলিল, 'সায়েব কেন হবে দিদি, আমার ভাই।'

'ভাই?' বলিয়া মেয়েটা মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া পাশের মেয়েটির গায়ে একটা ঠেলা দিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিল, 'জমিদারের ছেলে তোর ভাই? মা'র পেটের ভাই নয় ত?'

'ভাই' বলা তাহার উচিত হয় নাই। এক মা'র' 'পেটের সন্তান ভাই আর বোন্। একজন বড়লোক, একজন গরীব। লোকে ইহা বিশ্বাস করিবেই বা কেন?

মল্লিকা তাড়াতাড়ি ভোগ-মন্দিরে গিয়া ঢুকিল্।

খুন্তি দিয়া কড়াইএর তরকারিটা একবার নাড়িয়া তাহারই শব্দে নিজের কণ্ঠস্বর মিলাইয়া ধীর মৃদুকণ্ঠে মল্লিকা আপন-মনেই প্রশ্ন করিল, 'ভাই টুকুন, আমার মা বেঁচে আছেন ত ? বাবা ?'

বলিতে বলিতে বুকের ভিতরটা তাহার মোচড় খাইয়া উঠিতেই সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

হাতের উল্টাপিঠে চোখের জল মুছিয়া সে উনান হইতে তরকারি নামাইবার জন্য সাঁড়াশীটা তুলিয়া লইল। সহসা বহুদূরে আবার একটা বন্দুকের আওয়াজ হইতেই আচম্‌কা চমকিয়া উঠিয়া কড়াই-সুদ্ধ গরম তরকারি তাহার পায়ের উপর উল্‌টাইয়া ফেলিয়া মল্লিকা ভাল করিয়াই কাঁদিতে বসিল।

জননী

মেয়ে ত' অনেকেরই হয়, কিন্তু এমন মেয়ে—

সবাই বলে, 'বাবা, জন্মে কখনও দেখিনি।'

মেয়ে বড়লোকের, এবং শুধু বড়লোকের নয়—ওই একমাত্র। বাল্যকালে মা মরিয়াছে, আদর-যত্নে প্রতিপালিত, তের বছরের মেয়ে—মনে হয় যেন ষোলো বছরের যুবতী। মোটা-সোটা কদাকার কুৎসিত নয়, অস্থিচর্ম্মসার রোগা-পট্‌কা নয়,—পল্লীগ্রামের সতেজ সবুজ দেবদারুর মতই স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী।

বাবা ডাকেন, 'শঙ্করী!'

বাড়ীর ছাদের উপর শঙ্করীর গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। বলে, 'যাই।'

'যাই' বলিয়া আর আসে না। কেদারবাবুর ভয় হয়। বর্ষায় পিছোল্ কাঠের সিঁড়ি দিয়া দস্যি মেয়ে ছাদে উঠিয়াছে, পা হড়্কাইয়া পড়িয়া যাইতেই-বা কতক্ষণ! রাগিয়া বলেন, 'ছাতে উঠেছিস্ কেন? নেমে আয় শীগ্গির! নেমে আয় বলছি।'

ছাদের কিনারে ছোট প্রাচীরের উপর মুখ বাড়াইয়া শঙ্করী বলে, 'কি বলছ তুমি বল না বাপু ওইখান থেকে। দেখতে পাচ্ছ না—আমি—ঘুড়ি ওড়াচ্ছি যে!'

ঘুড়ি!···কেদারবাবু অবাক্।

নিজেই শেষে ধীরে-ধীরে উঠিলেন। ছাদের সিঁড়িটার কাছে গিয়া ডাকিলেন, 'আয় মা, নেমে আয় শঙ্করী। ছি, ছি, ছাতে উঠে ঘুড়ি ওড়ানো···অত বড় মেয়ে, লোকে দেখলে—'

বলিতে বলিতে হঠাৎ তিনি থামিয়া গেলেন। বেশি কথা বলিবার উপায় নাই।

শঙ্করীর মাথাটা বোধকরি আজ ঠাণ্ডা ছিল। ছাদ হইতে নামিয়া আসিল। এবং নামিয়া আসিয়াই

ঘুড়ি ও লাটাইটা তাঁহার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'ঘুড়ি ওড়াব তাও তোমাদের সহ্য হোলো না। বাবা রে বাবা!'

বলিয়াই সে ছুটিয়া পলাইতেছিল, কেদারবাবু ধরিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, 'ভবদেবের পেঁপে গাছটা কে কেটেছে রে? ভবদেব নালিশ করতে এসেছিল।'

শঙ্করী হাসিল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ, দিয়েছি কেটে। দিইছিই ত!'

'কেন কাটলে? ছি! পরের অনিষ্ট করতে আছে কখনও?' বলিয়া মেয়েকে তাঁহার আদর করিয়া কেদারবাবু কাছে টানিয়া আনিলেন।

শঙ্করী বলিল, 'দেব না? ভব'দার বৌকে বললাম, ওই পাকা পেঁপেটা দে বৌ, আমরা কেটে কেটে খাই, এই সময় ভব'দা বাড়ী নেই। তা মাগী কি-না আমায় যা' তা' বলে' তেড়ে মারতে এলো। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। কেটেছি' বেশ করেছি।'

কেদারবাবু বলিলেন, 'ছি! ও-কথা কি বলতে আছে মা! পেঁপে খাবার ইচ্ছে হয়েছিল, আমায় তুমি বললে না কেন?'

শঙ্করী এবার মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; কথাটার জবাব খুঁজিয়া পাইল না।

কেদারবাবু বলিলেন, 'দশটি টাকা দিয়ে ভবদেবকে বিদেয় করলাম। এমন করে' জরিমানা আর আমি কত দেব মা? বল্ আর দুষ্টুমি করবি নে!'

ঘাড় হেঁট করিয়া শঙ্করী বলিল, 'না।'

দিন-কয়েক্ পরেই দুর্গা পূজা।

কেদারবাবুরা তিন ভাই—তিন সরিক্। কিন্তু এই পূজার সময় সকলেই একত্র হয়।

চারিদিকে লোকজনের ছুটাছুটি। কেদারবাবুর বিশ্রামের আর এতটুকু অবসর নাই। শঙ্করীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখিস্ মা, পূজোর সময় আর দৌরাত্ম্যি করিস্ নে যেন।'

শঙ্করী বলিল, 'কি যে বল বাবা তার ঠিক নেই। আমি বুঝি দৌরাত্ম্যি করি'?

কেদারবাবু ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার কাজে চলিয়া গেলেন। দুর্গাবাড়ীর প্রকাণ্ড চত্বরে বড় বড় কাঁচা বাঁশের খুঁটি দিয়া সামিয়ানা খাটানো হইতেছে। রাণীগঞ্জ হইতে আলোর ঠিকাদার পঞ্চু তখন পাঁচ-পাঁচটা পাঞ্চ্-লাইটে কেরোসিন তেল দিয়া পাম্প্ করিতে সুরু করিয়াছে। এ বৎসর আর দেশোয়ালী যাত্রা হইবে না। কলিকাতা হইতে সাবিত্রী অপেরা পার্টির প্রকাণ্ড দল আজ সকালের ট্রেণে তাহাদের গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ধূমধামের আর অন্ত নাই।

সন্ধ্যার পরে যাত্রা আরম্ভ। সংবাদ পাইয়া আশ-পাশের প্রায় দশ-বারোখানা গ্রামের লোক সন্ধ্যা হইতে না হইতেই সামিয়ানার নীচে জড়ো হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে আলো জ্বলিল, আসর পাতা হইল, বাজনা বাজিল, প্রোগ্রাম বিলি হইল, কিন্তু চারি

দিকে এত এত লোকের ভিড়—গোলমাল কিছুতেই থামে না!

বাবুদের বাড়ীর ছেলেরা সিল্কের জামা পরিয়া ছড়ি হাতে লইয়া লোকগুলাকে বসাইয়া দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গোলমাল চুপ করাইবার চেষ্টা করিতেছে।

তাই বলিয়া যাত্রা বন্ধ রাখা চলে না। সবাই বলিতে লাগিল, যাত্রা আরম্ভ হইলেই গোলমাল থামিবে। দলের ম্যানেজার কেদারবাবুর হুকুম লইয়া গিয়া আসর হইতে ঢং করিয়া একটা ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেন।

তৎক্ষণাৎ একদল সখী আসিয়া নাচিয়া নাচিয়া গান আরম্ভ করিল।

অথচ গোলমাল তাহাতেও থামিল না।

তাহার পরেই প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য, রাজপথ, শ্রীকৃষ্ণের বক্তৃতা।

শ্রীকৃষ্ণের পরনে ভেল্‌ভেটের উপর সাম্‌লা-চুম্‌কির কাজ-করা পোষাকটা নিতান্ত খাটো হইয়াছিল বলিয়া বেচারা ভাল করিয়া নড়িতে-চড়িতে পারিতেছিল না।

তা না পারুক্, ছোকরার রং কালো হইলেও চেহারা ভালো, বক্তৃতাও সে করিতেছিল প্রাণপণে চীৎকার করিয়া, কিন্তু তবু তাহার এক বর্ণও শোনা যায় না।

কেষ্টর শেষ কথাটা শুনিতে না পাইয়া পাছে ঠিক সময়ে আসরে ঢুকিতে না পারে বলিয়া সাজঘর হইতে রাধিকাকে অনেকখানি আগাইয়া আসিতে হইয়াছে।

আসরে ঢুকিবার ফটকের কাছাকাছি একটা পানের দোকানের পাশে দাঁড়াইয়া রাধিকা বিড়ি টানিতেছিল। নিজের বক্তৃতা শেষ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া চোখ টিপিয়া কেষ্ট তাহাকে আসিতে বলিল।

আসরে তখন হারমোনিয়ামে সুর দিয়াছে। রাধিকাকে গান গাহিয়া গাহিয়া ঢুকিতে হইবে।

গানের প্রথম কলিটা আরম্ভ করিয়া হাসি-হাসি মুখে সে কেষ্টর কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

এবং যেই দাঁড়ানো, আর অমনি কপালে হাত দিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কান্না!

ব্যাপার দেখিয়া ত' সকলেই অবাক্! যাহারা

এতক্ষণ গোলমাল করিতেছিল, হঠাৎ তাহারা চুপ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল।

কোথা হইতে সজোরে একটা ঢিল আসিয়া রাধিকার কপালে লাগিয়াছে।

এত বড় একটা ঢিল—ধাঁ করিয়া আসিয়া লাগিল তাহার কপালে; বেচারা নিতান্ত ছেলেমানুষ,—কাঁদিয়া ফেলিবার কথাই।

কিন্তু এই এতগুলা লোকের মধ্যে কে যে ঢিল ছুঁড়িয়াছে এবং কেন যে ছুঁড়িয়াছে, কে জানে। তবে ঢিলটা কোন্‌দিক হইতে আসিয়াছে, কাছে যাহারা বসিয়া ছিল তাহারা ঠিক বলিয়া দিল।

কেদারবাবুর ভাইপো নরেশ গেল তাহার সন্ধান করিতে।

আসরের লোকজন তখন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে রাধিকাকে লইয়া।—'চুপ কর্! ছি! কাঁদে না, ও আর কী এমন হয়েছে! রক্ত ত' পড়ে নি?'

সাজ-ঘরে টিঞ্চার আইডিন ছিল; ম্যানেজার নিজে গিয়া শিশিটা লইয়া আসিলেন। লোকজন সরাইয়া

রাধিকার ফোঁটা-তিলক-কাটা কপালের এক পাশে তাহাই খানিকটা লাগাইয়া দিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, 'ওঠ্ বাবা ওঠ্, ভারি ত' একটু লেগেছে, তার আবার ফুলে' ফুলে' কান্না ছ্যাখো ছেলের ! অমন কত লাগে ! ওঠ্, আমার যাত্রা মাটি হয়ে গেল। ওঠ্, এইবার সব চুপ করেছে, গানটা জম্‌বে ভালো। নাও হে নাও, তোমরা আর হাঁ করে' বসে থেকো না। লাগাও সঙ্গৎ !'

বলিয়া তিনি একরকম জোর করিয়াই রাধিকাকে দাঁড় করাইয়া দিলেন।

আবার গান চলিতে লাগিল।

শ্রোতারা তখন চুপ করিয়াছে।

কেদারবাবু আসরের এক পাশে বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন, এমন সময় নরেশ তাহার ছড়ি হাতে হন্তদন্ত হইয়া ছুটিতে ছুটিতে তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল, 'আসুন !'

হুঁকাটা অন্য হাতে দিয়া মুখ তুলিয়া কেদারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন রে ?'

'আসুন, আপনি একবার উঠেই আসুন না !'

কেদারবাবু উঠিয়া তাহার পিছু পিছু চলিতে লাগিলেন।

পূজার তিন দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর আজ বিজয়া-দশমী—কেদারবাবুর পা যেন আর চলিতেছিল না।

তাঁহার বৈঠকখানার সুমুখে গিয়া নরেশ থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'কে ঢিল ছুঁড়েছিল জানেন ?'

'কে ?'

নরেশ বলিল, 'দেখুন খুলে'। এই ঘরে আমি বন্ধ করে' রেখেছি।'

কেদারবাবুর বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল—শঙ্করী নয় ত ?

শিকল খুলিয়া দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিতেই দেখিলেন, জানালার পথে পাঞ্চ্-লাইটের খানিকটা আলো ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছে এবং সেই আলোকে স্পষ্ট

দেখা গেল, বসিবার চৌকিটার পাশে খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া—শঙ্করী !

নরেশ বলিল, 'ওদের জয়ীর সঙ্গে পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগ্‌রেট্‌ টানছিল। বল্‌লে, ঢিল ছুঁড়েছি বেশ করেছি। গোলমাল কর্‌ছিল থামিয়ে দিয়েছি।'

প্রত্যুত্তরে কেদারবাবু একটি কথাও বলিলেন না। নরেশের হাতে ছিল বেতের ছড়ি। তাহাই তিনি কাড়িয়া লইয়া নীরবে আগাইয়া গিয়া শঙ্করীর পিঠের উপর সপ্‌ সপ্‌ করিয়া সজোরে ঘা-কতক বসাইয়া দিলেন।

বেতের ছড়ি কাপড়-জামা ভেদ করিয়া শঙ্করীর পিঠের চামড়ায় গিয়া লাগিল। 'মা গো!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া শঙ্করী আত্মরক্ষা করিবার জন্য চৌকির ও-পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই। কেদারবাবুর মাথায় তখন খুন চাপিয়াছে। চৌকিটা ডিঙ্গাইয়া গিয়া আবার তিনি শঙ্করীর গায়ে মাথায় হাতে পিঠে যেখানে পাইলেন সজোরে বেত চালাইতে লাগিলেন।

এবার আর শঙ্করী একটি কথাও উচ্চারণ করিল না, হাত দিয়া বার-কতক সে তাহার পিতার প্রহার প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল মাত্র, কিন্তু কিছুতেই না পারিয়া শেষে দাঁতে দাঁতে চাপিয়া সে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আর চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া অনবরত জল গড়াইতে লাগিল।

চোখের সুমুখে এত মার নরেশেরও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কেদারবাবুকে একরকম জোর করিয়াই সে সেখান হইতে টানিয়া আনিয়া দরজার শিকলটা আবার টানিয়া দিয়া বলিল, 'থাক্, ও এই ঘরের মধ্যেই বন্ধ থাক্ সারারাত। আপনি যান।'

হাতের ছড়িটা ফেলিয়া দিয়া উন্মাদের মত কেদারবাবু একবার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন, একবার উঠানের উপর বারকতক পায়চারি করিলেন, তাহার পর আপন মনেই বিড়-বিড় করিয়া কি যেন বকিতে বকিতে তাঁহার দোতলার ঘরে গিয়া খিল্ বন্ধ করিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন। গত তিনটি দিনের মধ্যে এমন করিয়া হাত-পা ছড়াইয়া শুইবার অবসর তাঁহার একটি

মুহূর্তের জন্যও মিলে নাই,—শুইবামাত্র তাঁহার ঘুমাইয়া পড়িবার কথা, কিন্তু কন্যাকে প্রহার করিয়া আসিয়া অবধি কিসের যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা ভিতরে ভিতরে তাঁহাকে এমনিভাবে পীড়িত করিয়া তুলিতে লাগিল যে, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত শয়নে তাঁহার না হইল তৃপ্তি, চোখে তাঁহার না আসিল ঘুম। শঙ্করীর মাতার মৃত্যুর পর হইতে আজ অবধি শঙ্করীকে প্রহার করা দূরে থাক্ কোনো দিন একটি রূঢ় কথা বলিয়া তাহাকে শাসন করিতে তাঁহার কোথায় যেন বাধিয়াছে। অথচ আজ তিনি এত বড় নিষ্ঠুর হইলেন কেমন করিয়া! কেদারবাবু নিজেকেই নিজের আচরণের জন্য বারে-বারে ধিক্কার দিতে দিতে হঠাৎ কোন্ সময় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, রাত্রির শেষ প্রহরে কি যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিলেন। অপরাধীর মত ধীরে-ধীরে বিছানা হইতে উঠিয়া গিয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া, দরজা খুলিলেন। সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া দেখেন, যাত্রা কখন্ ভাঙ্গিয়া গেছে,—লোকজন কেহ কোথাও নাই, চারিদিক নিস্তব্ধ।

কেদারবাবু বৈঠকখানার দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন।

শিকল খুলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, ঠাণ্ডা মেঝের 'উপর শঙ্করী কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রাত্রে হয় ত' কিছুই সে খায় নাই, মা'র খাইয়া হয় ত' সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছে। কেদারবাবু তাহার ঘুমন্ত মুখের পানে একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া আবার তেমনি সন্তর্পণে বাহির হইয়া আসিলেন।

বাহিরে আসিয়াই চীৎকার করিয়া ঝি-চাকরকে ডাকাডাকি সুরু করিয়া দিলেন।

সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

কেদারবাবু বলিতে লাগিলেন, 'বেরিয়ে যা সব আমার বাড়ী থেকে—কালই দূর হয়ে যা! কাউকে চাই নে আমি।'

কি অপরাধ যে তাহারা করিয়াছে কেহ বুঝিতে পারিল না।

বাবুর চীৎকার শুনিয়া লণ্ঠন হাতে লইয়া তরু-ঝি

বাহিরে আসিতেছিল, কেদারবাবু তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'মেয়েটা যে সন্ধ্যে থেকে পড়ে আছে বাইরের ঘরে, তা সে খেয়েছে কি না খেয়েছে, বেঁচে আছে না মরেছে, সে সবই বুঝি আমায় দেখতে হবে ? দূর, দূর ! কি জন্যে যে আছিস্ তোরা সব...... বেরো বেরো—আমার বাড়ী থেকে বেরো ! বাড়ীতে একটা গিন্নি-বান্নি—' বলিয়া কথাটা তাঁহার অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি আবার তাঁহার শুইবার ঘরে চলিয়া গেলেন।

নীচে ঝি-চাকরের জটলা চলিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে তরু আসিয়া বাবুর দরজার কাছে দাঁড়াইল। ভয়ে-ভয়ে বলিল, 'মেয়ে ত' কিছু খেলে না বাবা !'

কেদারবাবু তেমনি শুইয়া শুইয়াই জবাব দিলেন, 'এই কি খাবার সময় না কি মানুষের ? এখন খেলে তার অসুখ করবে, খাওয়াস্ নে কিছু।'

'খাবে কেমন করে' বাবা ! গা-টা কেমন ছাঁক্-ছ্যাক্ করছে। জ্বর-জ্বালা কিছু হ'লো কি না

তাই-বা কে জানে!' বলিয়া ঝি সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিল।

কেদারবাবু তড়াক্ করিয়া বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। 'কি বললে তরু? জ্বর?'

'হ্যাঁ বাবা, গায়ে হাত দিয়ে দেখি, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে।'

'হবে না? বেশ হয়েছে। ঠাণ্ডা মেঝের ওপর সারারাত···মর্ মর্—ছি ছি, আমার মরণটা হ'লে বাঁচি। চল্, দেখি।' বলিয়া তিনি ঝি'র পিছু-পিছু পাশের ঘরে গিয়া দেখিলেন, শঙ্করীকে তাহার বিছানার উপর আনিয়া শোওয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। গায়ে মাথায় হাত দিয়া দেখিলেন, সত্যই জ্বর। ডাকিলে সাড়া দেয় না। বেহুঁস অবস্থায় কোনো রকমে সে এখানে আসিয়াই জ্বরের ধমকে আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

গ্রামে ডাক্তার নাই। বুড়া দয়াল কবিরাজকে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া আনা হইল। কোনও ভয় নাই বলিয়া লাল-লাল গোটাকতক বড়ি তিনি দিয়া গেলেন। কিন্তু তিন চার দিন পরে শঙ্করী যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সম্পূর্ণ

নিরাময় হইয়া আবার তেম্নি আগের মত ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতে লাগিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেদারবাবুর আশঙ্কা, উদ্বেগ, এবং প্রার্থনার আর অন্ত রহিল না।

বিবাহ দিলে হয় ত' তাহার এই চঞ্চলতা থামিয়া যাইতে পারে ভাবিয়া কেদারবাবু এইবার শঙ্করীর বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাই-বা কেমন করিয়া সম্ভব! বিবাহের পর কন্যা তাঁহার শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাইবে, একটি দিনের জন্যও হয় ত' তাহাকে আর তিনি দেখিতে পাইবেন না, হয় ত' তাহার এই চঞ্চল স্বভাবের জন্য শ্বশুর-শাশুড়ী তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে তিরস্কার করিবে, শাস্তি দিবে, অথচ বলিবার কিছু থাকিবে না, কন্যার সম্পূর্ণ অধিকার পরের উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে।

দু'তিনটা সম্বন্ধ তিনি নিজে ভাঙ্গিয়া দিলেন। ভাল ঘর, ভাল বর, জমিদারের ছেলে—কিন্তু না,

কেদারবাবু বলিলেন, 'আর কিছুদিন পরে হ'লেই যেন ভাল হয়। মেয়ে এখন আমার নিতান্ত ছোট।'

কিন্তু 'ছোট'র অজুহাত দেওয়া বুঝি আর চলে না।

বয়সকে ফাঁকি দিয়া শঙ্করী প্রতিদিন যেন বাড়িয়া চলিয়াছে।

ঘটক তিনি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারাই মেয়ে দেখিবার জন্য বরপক্ষকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে লাগিল। দু'একটা ভাঙ্গিয়া গেল কোষ্ঠীর মিল হইল না বলিয়া, দু'একটা ভাঙ্গিল টাকাকড়ির গোলমালে।

কেদারবাবু মনে-মনে খুশীই হইলেন।

কিন্তু ঘটকের কল্যাণে লোক আসা তখনও বন্ধ হয় নাই। কন্যাপক্ষ বড়লোক। বিবাহ হোক্ আর নাই হোক্, পাওনার লোভে মাসের মধ্যে অন্তত দু'টা সম্বন্ধ তাহারা আনিবেই।

এবার যাহাদের আনিল তাহারা বড়লোক।

কল্যাণচকের জমিদার। ছেলেটি কলিকাতায় থাকিয়া বি-এ পড়ে।

এমনটি বোধ হয় একবারও আসে নাই। টাকার খাঁকুতি একরকম নাই বলিলেই হয়। মেয়েটি পছন্দ হইলেই তাঁহারা বিবাহ দিবেন—এইরূপ ইচ্ছা। কেদার-বাবু ভাবিলেন, হয় ত' তাহা হইলে এইখানেই হোক্।

কিন্তু বিধির এম্‌নি বিড়ম্বনা—

গয়না কাপড় পরাইয়া পিঠে একপিঠ চুল খুলিয়া দিয়া শঙ্করীকে আনিয়া সেইখানে বসাইয়া দেওয়া হইল। পরমাসুন্দরী মেয়ে! অপছন্দ হইবার কিছুই নাই।

বরের বাবা নিজে দেখিতে আসিয়াছিলেন। শঙ্করীর আপাদ-মস্তক মুগ্ধদৃষ্টিতে একবার নিরীক্ষণ করিয়াই বলিলেন, 'এ আর দেখব কি। আহা চমৎকার মেয়ে! তোমার নাম কি মা?'

লজ্জায় শঙ্করী মাথা হেঁট করিল না, কথা বলিতে গিয়া থতমত খাইল না, স্পষ্ট পরিষ্কার তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'আমার নাম—শ্রীমতী শঙ্করী দেবী। ডাক-নাম টুনু।'

কেদারবাবু হাসিতে লাগিলেন।—'মেয়ে আমার লিখতে পড়তে সবই জানে। কাজকর্ম্ম রান্না-বান্না সব দিকেই ওস্তাদ।'

শঙ্করী ঈষৎ হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। বলিল, 'ধেৎ! রান্না-বান্না আমি কিছু জানি না।'

কেদারবাবু হঠাৎ অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া বলিলেন, 'তবে যে সেই সেদিন—মাছের ঝোলটা বলিলি আমি রাঁধলাম!'

শঙ্করী তাহার বাবার মুখের পানে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল, 'বা রে! তা আবার কখন্ বললাম?'

কেদারবাবুর অবস্থাটা বরকর্ত্তা বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি ব্যাপারটাকে তরল করিয়া দিবার জন্যই বোধ করি হো হো করিয়া খুব খানিকটা হাসিয়া বলিলেন, 'তা বেশ, তা বেশ, তোমার বাবার দেখ্ছ কি, সব মিছে কথা।'

শঙ্করী একটা ঢোঁক, গিলিয়া বলিল 'ওদের পাঁচী খুব ভাল রাঁধতে জানে। ওর মা ওকে শিখিয়েছে। আমার মা নাই যে!'

শেষের কথাটা সে এমনভাবে উচ্চারণ করিল যে, বরকর্ত্তার মুখের হাসি তৎক্ষণাৎ ম্লান হইয়া গেল। বলিলেন, 'তা হোক্, তুমি লেখাপড়া জানো ত' মা তাহ'লেই হবে।'

শঙ্করী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'উঁহুক্! পড়তে একটু-একটু পারি, কিন্তু লিখতে ভাল পারি না। কেলো-মাষ্টারের পাঠশালে 'দ্বিতীয় ভাগ' পড়তাম। তা কেলো-মাষ্টার একদিন আমাকে মেরেছিল। আমিও দিয়েছিলাম কাম্‌ড়ে তার হাতটাকে ছিঁড়ে একেবারে রক্ত বের করে'। বাস্, সেইদিন থেকে আর যাই না।'

চিঠি লিখিয়া তাঁহার অভিমত জানাইবেন বলিয়া বরকর্ত্তা চলিয়া গেলেন।

তাহার পর এক সপ্তাহ যায়, দু' সপ্তাহ যায়, চিঠি আর তিনি লেখেন না।

ঘটক তখন নিজে একদিন তাঁহার সন্ধান করিতে গেল।

ফিরিয়া আসিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া জানাইল,—'আজ্ঞে না কর্ত্তা, হ'লো না ওখানে। ছেলে এখন বিয়ে করতে রাজি নয়।'

কেদারবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, 'হবে না তা আমি সেইদিনই জানি। হতভাগা মেয়ের অদৃষ্টে দুঃখু আছে।'

বলিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কি যেন ভাবিয়া বলিলেন, 'এবার যা তুই যেখান থেকে পারিস্ যেমন হোক্ নিয়ে আয় সম্বন্ধ,—আমি সেই-খানেই বিয়ে দেব।'

ঘটক বুঝিল, এটা নিছক্ রাগের কথা। বলিল, 'তাহ'লে আজ্ঞে মাধবপাড়ার ওরা কি দোষ করেছিল? ঘর ভাল, বর ভাল, পাঁচশ' টাকা বেশি চেয়েছিল বই ত' নয়। তা রাজি হয়ে যান ত' দেখুন আমি তাদেরই আবার ধরে' নিয়ে আসি।'

কেদারবাবু বলিলেন, 'তাই আন্।'

তাহাই হইল।

মাধবপাড়ার মুখুজ্যেরা মাঝারি-গোছের গৃহস্থ। ছেলেটির বয়স একটুখানি বেশি, দেখিতেও তেমন সুশ্রী নয়। তা হোক্, পুরুষ আবার সুশ্রী কুশ্রী আছে নাকি?

একে বড়লোক, তায় আবার ওই একটি মাত্র মেয়ে। পাঁচশ' টাকার একটা দাঁও কষিয়া রাখিয়া ভিতরে ভিতরে তাহারা প্রস্তুত হইয়াই ছিল।

বরের বাপ আসিয়া তাহার পরের দিনই ধান-দূর্ব্বা এবং পাঁচটি টাকা হাতে দিয়া শঙ্করীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন।

বিবাহ যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো।

এবং হইলও তাই।

বর দেখিয়া সকলেই অবাক্!—যেমন রোগা, তেমনি ঢ্যাঙ্গা,—তার না আছে মুখের শ্রী, না আছে চলার ছাঁদ।

পাড়া-পড়্শীরা কেদারবাবুর দোষ দিতে লাগিল। 'মিন্সে এদ্দিন ধরে' তবে করছিল কী গা! ওমা!

এত এত টাকা খরচ করে' শেষে কি না এই বাঁদরটাকে ধরে নিয়ে এলো।'

বয়স্কা যাহারা, তাহারা বলিল, 'মিছে তর্ক মা, ও যার যা বরাতে থাকে। মা-মরা মেয়ের সুখ হওয়া বড় শক্ত।'

যুবতীরা রাত্রে বাসর জাগাইতে আসিয়া জামাইকে লইয়া ঠাট্টা-তামাসা করিতে থাকে। বলে, 'কি হে, তোমার কি পানের দোকান ছিল না কি ভাই?'

জামাই রাগিয়া মুখ ভারি করিয়া কাহারও কথার জবাব দেয় না। বলে, 'যান আপনারা, আমার ঘুম পেয়েছে, বিরক্ত করবেন না।'

জামাই যত রাগে মেয়েরা তত রাগায়।

শঙ্করী কিন্তু মুখ তুলিয়া একবার চাহিয়াও দেখে না।

* * * *

ব্যাপারটা যে কেদারবাবু বুঝেন নাই তাহা নয়। কিন্তু এখন আর বুঝিয়াই বা উপায় কি!

বিবাহের সমস্ত ব্যাপার চুকাইয়া, নিজের ঘরে গিয়া একটু হাত-পা ছড়াইয়া শুইতে তাঁহার অনেক রাত্রি হইয়াছিল। কিন্তু রাত্রি অধিক হইলে কি হইবে, ঘুম তাঁহার চোখে আসিল না। প্রথমেই মনে পড়িল তাঁহার স্ত্রীকে।—স্ত্রীর সেই অন্তিম-শয্যা। তিন মাস রোগ ভোগ করিয়া সত্যই সে যেদিন বুঝিল আর বাঁচিবে না, সেদিন চোখে তাহার সে কি করুণ দৃষ্টি! মরিতে সে চায় না, তবু তাহাকে মরিতে হইবে। শঙ্করীকে কাছে ডাকিয়া বুকের উপর টানিয়া সে কী কান্না! মুখে কথা নাই, চোখ দিয়া শুধু ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিতেছে। শঙ্করীর হাতখানা তাঁহার হাতে ধরাইয়া দিয়া স্ত্রী তাঁহার নিতান্ত করুণ কণ্ঠে কহিল, 'দেখো।'

শঙ্করী তখন নিতান্ত ছোট। ছোট হইলেও মৃত্যুর অভিজ্ঞতা হয় ত' তাহার হইয়াছে। মুখখানি শুক্‌নো। চোখ দুইটি ছল্ ছল্ করিতেছিল।

কেদারবাবু বলিলেন, 'আঃ, ছি! কি করছ গো!'

আর-কিছু তিনি বলিতে পারেন নাই। বলিবার ছিলই বা কি!

তাহার দু'দিন পরে মৃত্যু! বাহিরে ঝম্ ঝম্ করিয়া জল ঝরিতেছে। নীরব নিস্তব্ধ রাত্রি। পাশের ঘরে শঙ্করী ঘুমাইতেছে। ঝি চাকর সকলকে বিদায় করিয়া দিয়া বিছানার পাশে কেদারবাবু একাকী বসিয়া আছেন।

থাকিয়া থাকিয়া আজ তাঁহার শুধু সেই দৃশ্যই মনে পড়িতে লাগিল।—'আজ তোমার সেই শঙ্করীর বিবাহ। আজ তুমি কোথায়?'

চোখের জল মুছিয়া তিনি বিছানার উপর ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। জানালার পথে ঠাণ্ডা বাতাস আসিয়া গায়ে লাগিতেই চাহিয়া দেখিলেন, প্রভাত হইতে আর বেশি বিলম্ব নাই। জানালার বাহিরে তাঁহারই বাঁধানো পুকুরের পাশ দিয়া বাউরী কুলি-মজুরেরা গান গাহিতে গাহিতে কয়লা-কুঠিতে কাজ করিতে চলিয়াছে। সুমুখে সবুজ ধানের ক্ষেত—দূরে একটি গাছে-ঘেরা ছোট্ট গ্রামের প্রান্তে গিয়া শেষ হইয়াছে। তাহারই মাথার উপর রক্তবর্ণ রঞ্জিত আকাশ। বোধকরি সূর্য্যোদয় হইতেছে। সেই দিক পানে কিয়ৎক্ষণ তিনি তাঁহার একাগ্র দৃষ্টি

নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর যুক্তকরে বারম্বার প্রণাম করিতে করিতে তিনি আপন মনেই বলিতে লাগিলেন, 'হে জ্যোতির্ম্ময় দিবাকর, হে বিশ্বদেব, মেয়ের বিবাহ দিয়া অপরাধ করিলাম কি-না জানি না, যদি করিয়া থাকি ত' ক্ষমা করিও। শঙ্করীর সমস্ত সুখ-দুঃখের ভার তোমারই হস্তে সমর্পণ করিলাম। তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে সুখী করিও।'

পরদিন বিদায়ের পালা।

বর-কন্যা চলিয়া যাইবে। যে-শঙ্করীকে একটি দিনের জন্যও কেদারবাবু চোখের আড়াল করেন নাই, সেই তাহাকেই আজ এক নিতান্ত অপরিচিত সংসারে তাহার উপর সমস্ত দাবী-দাওয়া চিরজীবনের মত পরিত্যাগ করিয়াই পাঠাইতে হইবে।

অথচ উপায় নাই।

মাতৃহীনা কন্যার বিদায়ের আয়োজন মুখ বুজিয়া তিনি নিজেই করিতে লাগিলেন। দরজায় খিল বন্ধ

করিয়া নূতন একটি প্রকাণ্ড বাক্সের ভিতর শঙ্করীর ভাল ভাল জামা কাপড়, সেমিজ সায়া, আল্‌তা এসেন্স, সাবান চিরুণী—এমন-কি মাথার কাঁটাটি পর্য্যন্ত পরিপাটি ভাবে সাজাইয়া বাক্সটি বন্ধ করিতে গিয়া বুকের ভিতরটা তাঁহার হু হু করিয়া উঠিল, বাক্সের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া অতি কষ্টে কান্নার বেগ দমন করিতে গিয়া দুই হাতে মুখ চাপা দিয়া তিনি ভাল করিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সকালে কুশণ্ডিকা হইয়া গেছে। শঙ্করীর সিঁথিতে সিঁদূর দিয়া মাথায় ঘোম্‌টা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর হইতে সে আর তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়ায় নাই। সন্ধ্যায় নিজে খাইতে বসিয়া কেদারবাবু ডাকিলেন, 'শঙ্করী!'

কেদারবাবুর এক ভাই-ঝি ছিল কাছে দাঁড়াইয়া। শঙ্করীকে সে ডাকিয়া দিল।'

সর্ব্বাঙ্গে সোনার অলঙ্কার। পরণে চমৎকার একখানি শাড়ী। সিঁথিতে সিঁদূর, কপালে সিঁদূরের টিপ। সলজ্জ দেবী-প্রতিমার মত অপরূপ রূপলাবণ্যবতী

শঙ্করী ধীরে-ধীরে তাঁহার কাছে আসিয়া ডাকিল, 'বাবা!'

কেদারবাবু হেঁটমুখে অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন। ডাক শুনিয়া 'মা' বলিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

বলিবার কিছুই নাই, শুধু প্রাণ ভরিয়া একটিবার দেখিতে চান! জিজ্ঞাসা করিলেন, 'খেয়েছিস্ শঙ্করী?'

'না বাবা।'

'আয় তবে বোস্ এইখানে।'

শঙ্করী বসিল।

নিজের থালাটা দেখাইয়া দিয়া কেদারবাবু বলিলেন, 'খা।'

শঙ্করী বলিল, 'তুমি খাবে না বাবা?'

'এই যে খাই।' বলিয়া থালা হইতে তিনি নিজেও একখানা লুচি তুলিয়া লইলেন।

তাহার পর বাল্যকালে শঙ্করীকে কাছে বসাইয়া যেমন করিয়া খাওয়াইতেন, সেদিনও ঠিক তেমনি করিয়াই খাওয়াইতে লাগিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে যাইবার দিন।

পাল্‌কি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়াছে।

লোকাচার-মতে কেদারবাবুকে কন্যার সুমুখে অঞ্জলি পাতিয়া দাঁড়াইতে হইল। ইঁদুরের গর্ত্তে বেওয়ারিশী চুরি-করা যে চা'ল থাকে, তাহাই একমুঠা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া শঙ্করী দাঁড়াইল তাহার পিতার সম্মুখে।

মেয়েরা বলিয়া দিল, 'ওই চালের মুঠোটা তোর বাবার হাতে দিয়ে বল্—এতদিন তোমার যা খেয়েছি, তোমার যা পরেছি, তা এই শোধ করে' দিলাম।'

চালের মুষ্টি পিতার প্রসারিত অঞ্জলিপুটে ফেলিয়া দিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও শঙ্করীকে তাহাই বলিতে হইল।

ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিতে গিয়া কেদারবাবুর কি যে হইল কে জানে, দাঁতে দাঁত চাপিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে এমনভাবে চলিয়া গেলেন যে, শঙ্করী তাঁহাকে প্রণাম করিবারও অবসর পাইল না।

এইবার শঙ্করী কাঁদিয়া ফেলিল। মেয়েরা

তাহাকে চুপ করাইতে করাইতে গাঁট-ছড়া-বাধা বরের সঙ্গে পাল্‌কির কাছে লইয়া গেল।

রৌদ্র বেশি হইতেছিল বলিয়া বেহারারা অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। শঙ্করী কিন্তু কিছুতেই পাল্‌কিতে চড়িতে চায় না, সজল চক্ষে বারে বারে শুধু সে এদিক-ওদিক তাকাইয়া কাহাকে যেন খুঁজিতে থাকে।

কিন্তু অত-সব মনের কথা বুঝিবার মত বুদ্ধি সেখানে কাহারও ছিল না, শঙ্করীকে তাহারা একরকম জোর করিয়াই বরের পাশে পাল্‌কিতে বসাইয়া দিয়া কি একটা রসিকতা করিয়া বাড়্ দুইটা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল এবং বেহারারা তৎক্ষণাৎ পাল্‌কি তুলিয়া লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

কেদারবাবু এতক্ষণে ছুটিতে ছুটিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মেয়েরা তখন আপন-আপন বাড়ীর দিকে চলিতেছে; কে একজন বর্ষীয়সী মহিলা কহিল, 'চলে' গেল বাছা তুমি এতক্ষণে এলে?'

'হ্যাঁ এই জামাটা।' বলিয়া তিনি তাঁহার নিজেরই হাতের পানে তাকাইয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন,

জামা তিনি আনিতে ভুলিয়াছেন ; এবং জামার ছুতা করিয়া কন্যার মুখখানি আর-একবার দেখিবার সুযোগ হয়ত-বা তাঁহার হইলেও হইতে পারিত, কিন্তু পাল্‌কি তখন অনেক দূরে।

পাঁচ দিন পরে শঙ্করী ফিরিল। অষ্ট-মঙ্গলার পর আবার গেল, আবার আসিল। এবার কিন্তু জামাই আসিয়াই শ্বশুরমহাশয়কে একটি প্রণাম করিয়া পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, 'বাবা দিয়েছেন।'

বৈবাহিকের চিঠি। চিঠিখানি কেদারবাবু তৎক্ষণাৎ পড়িয়া ফেলিলেন। যথাযোগ্য নমস্কারান্তে তিনি নিবেদন করিয়াছেন—'দু'দিন পরেই বিপিনের সঙ্গে শ্রীমতী বধূমাতাকে এ-বাটি পাঠাইয়া দিবেন। সেইজন্যই বিপিনকে সঙ্গে দিলাম। বধূমাতার বয়স হইয়াছে, কিন্তু আপনার বাড়ীতে অভিভাবিকা কেহ নাই বলিয়াই হোক্ কিম্বা যে-কোনও কারণেই হোক্, তাহার

বুদ্ধি-শুদ্ধি এখনও পরিপক্ক হয় নাই। তাহাকে এখন কিছুদিন আমরা এইখানেই রাখিব। ইহাতে কোনো প্রকারেই অন্যমত করিবেন না। আপনার বৈবাহিকার এবং আমার কন্যাদের তাহাই ইচ্ছা জানিবেন। পাঠাইতে অন্যথা যেন না হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।'

চিঠিখানি মুড়িয়া রাখিয়া কেদারবাবু একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'বেশ, তাই হবে।'

বলিলেন বটে, কিন্তু মনের মধ্যে তাঁহার অহরহ শুধু এই কথাটাই বারে-বারে উদয় হইতে লাগিল যে, বিবাহের পর, সেদিন সেই বিদায়ের মুহূর্তে কন্যা তাহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দিয়াছে। কন্যার উপর আর কোনও অধিকারই তাঁহার নাই। বৈবাহিক লিখিয়াছেন, বধূমাতার বয়স হইয়াছে কিন্তু বুদ্ধি তাহার এখনও পরিপক্ক হয় নাই। মেয়েটা হয় ত' সেখানে গিয়াও তাহার স্বভাব-সুলভ চঞ্চলতা প্রকাশ করিয়াছে, হয় ত' এমন-কিছু করিয়া বসিয়াছে, যাহার জন্য তাঁহারা চটিয়া গিয়াছেন এবং সেইজন্যই বোধ করি তাহার এই শাস্তির ব্যবস্থা।

বাড়ীতে গৃহিণী নাই। কেদারবাবু কি আর করেন, শঙ্করীকে কাছে ডাকিয়া পাশে বসাইয়া পিঠে হাত দিয়া, মুখের পানে একাগ্র দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন, 'সেখানে তোর কষ্ট হয় নি ত' মা?'

শঙ্করী মুখ তুলিয়া বলিল, 'হাঁ বাবা, হয়েছিল। ওখানে আর আমায় পাঠিয়ো না কিন্তু। আমি যাব না বলে' দিচ্ছি।'

কেদারবাবুর বুকের ভিতরটা সহসা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। কন্যার পিঠের উপর ধীরে-ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'ছি মা, ও-কথা কি বলতে আছে? যাবে, আবার আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসব।'

শঙ্করী বলিল, 'প্রথমবারে কেউ কিছু বলে নি বাবা, কিন্তু এবারে গিয়ে আমি খুব কেঁদে ফেলেছিলাম। সত্যি বলছি বাবা, আর আমায় পাঠিয়ো না তুমি।' বলিতে গিয়া চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিল। বলিল, 'একদিন একটা কাঁচের গেলাস্ ভেঙ্গে ফেলেছিলাম, আর একদিন মার্বেল্ খেলেছিলাম, আর লাট্টু ঘুরিয়েছিলাম—সেই পিণ্টু বলে' একটা ছেলে

আছে আমার ঠাকুরাঝির,—সেই তার সঙ্গে। আর কিচ্ছু করি নি বাবা, মা-কালীর দিব্যি ক'রে বলছি। তাইতে আমার সে কী বকুনী! শাশুড়ী-মাগী ত' একেবারে যা-না-ইচ্ছে তাই! 'সারারাত আমি তোমার জন্যে কেঁদেছিলাম।'

কেদারবাবু হেঁট্‌মুখে কিয়ৎক্ষণ কি যেন ভাবিলেন, তাহার পর ধীরে-ধীরে শঙ্করীকে অনেক কথাই বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শঙ্করীর সেই এক কথা—'আমি আর গেলে ত!'

নিরুপায় হইয়া কেদারবাবু তাঁহার ভাই-ঝিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন, 'ছাখ্ মা তোরা যদি পারিস ওকে কোনও রকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে—'

এবং শুধু ভাই-ঝি নয়, পাড়ার মেয়েরা সকলে মিলিয়া শঙ্করীকে সেইদিন হইতে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার কথা বুঝানো দূরে থাক্, এতগুলো মেয়ে—একটিবারের জন্যও, এমন কি জোর করিয়াও তাহাকে, কেহ জামাইএর কাছে লইয়া যাইতে পারিল না।

বিপিনকে শেষে অগত্যা একাই ফিরিতে হইল। কেদারবাবু অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বৈবাহিক মহাশয়কে একখানি চিঠি লিখিয়া দিলেন। লিখিলেন, 'ভাই আমাকে ক্ষমা করিও। কোনো প্রকারেই এবার আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। মেয়েটা কান্নাকাটি সুরু করিয়াছে। এ অবস্থায় তাহাকে পাঠানো বিপদজনক। আমি একা মানুষ। মেয়েটার মা নাই যে বুঝাইবে। তাহা হইলেও আমি যত শীঘ্র পারি তাহাকে বুঝাইয়া নিজে গিয়া আপনার বাড়ীতে দিয়া আসিব।'

'পুনশ্চ—আপনি লিখিয়াছেন, আমার মেয়ের বয়স হইয়াছে। কিন্তু তাহা নয়। দেখিলে তাহাকে বড় বলিয়া মনে হইলেও আমি ভগবানের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, গত চৈত্র মাসে বয়স তাহার এই সবে বারো বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, এখন সে তেরোয় চলিতেছে।'

একটি বৎসর আর কোনও পক্ষের কোনও উচ্চবাচ্য নাই।

আমের সময় আম, পূজার সময় জামা-কাপড়, শীতের সময় শাল দিয়া কেদারবাবু তাঁহার জামাতাকে 'তত্ত্ব' করিয়া পাঠান, কিন্তু বরকর্তা নীরব। বধূমাতার জন্য না পাঠান 'তত্ত্ব', না দেন একখানা চিঠি।

কেদারবাবু মনে-মনে শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিলেও বলেন, 'না দিক্। মেয়ের আমার অভাব কিছু নেই।'

শঙ্করী হাসিয়া-খেলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। মেয়েরা তাহাকে খোঁচে ডাকিয়া তাহার বাড়ন্ত গড়নের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া হাসি-ঠাট্টা উপহাস-বিদ্রূপ করে, শঙ্করী হয়ত-বা কখনও তাহাতে কান দেয় না, আবার কখনও-বা রাগিয়া গিয়া মেয়েদের গায়ে থুতু দিয়া ঢিল ছুঁড়িয়া তাহাদের পরাস্ত করিয়া ছুটিয়া পলায়।

এমনি করিয়া একা নির্ভাবনায় তাহার দিন কাটিতে থাকে।

এমন দিনে হঠাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে

কেদারবাবুর কাছে তাঁহার বৈবাহিকের এক চিঠি আসিয়া হাজির!

'এবার যদি মেয়েকে আপনার না পাঠান্ তাহা হইলে ছেলের আমি আবার বিবাহ দিব। এই আমার শেষ চিঠি।'

চিঠি পাইয়া কেদারবাবু এইবার একটুখানি শক্ত হইয়া উঠিলেন। শঙ্করীকে বুঝাইবার কোনও চেষ্টাই আর করিলেন না।

পুরোহিতকে দিয়া একটি দিন দেখাইয়া শঙ্করীকে তাহার মামার বাড়ী লইয়া যাইতেছেন বলিয়া নিজেই তাহাকে সঙ্গে করিয়া বৈবাহিকের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন, 'ছেলেমানুষ ভাই ওর দোষ-অপরাধ কিছু নিও না।'

বৈবাহিক-মহাশয় কথাটা শুনিয়া টপ্ করিয়া খানিকটা জিব বাহির করিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, 'রাধামাধব! ও যে আমার ঘরের লক্ষ্মী! এসো মা এসো! তবে কি না···মেয়ে যদি তোমার এতই অবুঝ,

বিয়েটা দেওয়া তোমার উচিত হয় নি। বেক্ষজ্ঞানা-টানি হয়ে গেলেই পারতে।'

শ্লেষের অর্থ তিনি বুঝিলেন। কিন্তু কন্যার পিতা,—বুঝিলেও কিছু বলিবার উপায় নাই।

কন্যার কাছে বিদায় লইতে গিয়া দেখিলেন, শঙ্করী কাঁদিতেছে।

অন্তরাল হইতে বেয়ান-ঠাকরুণের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মেয়ের বয়েস না কি শুনলুম বেই-মশাই লিখে পাঠিয়েছিলেন বারো, কিন্তু ভাই আমরা সব অসভ্য-বর্ব্বর মানুষ, সব জিনিসই উল্টো বুঝি। ১২টাকে ভাই উল্টে নিয়েছিলুম।...তা এতই যদি কাঁদছ মা, তা বেশ হয়েছে, এক বছর পরে পায়ের ধূলো দিয়ে আমাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করেছ, এবার আবার বাপের গলা জড়িয়ে ধরে' চলে' যাও।'

কেদারবাবুর মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না, ক্রন্দনরতা কন্যাকে চুপ করাইবার চেষ্টাও করিলেন না, ধীরে-ধীরে শুধু 'আসি' বলিয়া নিজের চোখের জল গোপন করিবার জন্য সেই যে তিনি তাড়াতাড়ি পিছন

ফিরিলেন, দুর্নিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও মেয়ের মুখের পানে আর-একবার ফিরিয়া তাকাইবার সাহসটুকু পর্য্যন্ত তাঁহার আর হইল না।

বিবাহ দিয়া যাহার দুরন্তপনা থামাইতে চাহিয়াছিলেন, কেদারবাবু আজ আবার তাহাকেই ফিরিয়া পাইতে চান।

এক শঙ্করীর অভাবেই সমস্ত বাড়ীখানি তাঁহার দিবা-রাত্রি খাঁ খাঁ করিতে থাকে; দাপাদাপি নাই, ছুটাছুটি নাই, হাসি নাই, কান্না নাই, গোলমাল নাই,—সমস্ত পৃথিবী নিথর নিস্তব্ধ; কোলাহলমুখরিত এই শব্দময়ী ধরিত্রীর পরমায়ু যেন শেষ হইয়া গেছে।

শঙ্করী যে-ঘরে থাকিত, কেদারবাবু এক-এক সময় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পা টিপিয়া টিপিয়া সকলের অলক্ষ্যে সেই ঘরে প্রবেশ করেন; নীলরঙের বাক্সটি তাহার যেখানে থাকিত সেটি সেখানে নাই; আলনার অব্যবহৃত কাপড়-জামা দিব্য পরিপাটি সাজানো। কিন্তু এ

পরিচ্ছন্নতা এখন আর তাঁহার ভাল লাগে না। শঙ্করী থাকিতে চারি দিক যেমন বিশৃঙ্খল হইয়া থাকিত, আজও তিনি তেমনিটি দেখিতে চান। চুপি চুপি তাহার কাপড় জামাগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখেন; বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া ওঠে, না জানি সেখানে সে কত কষ্টই না পাইতেছে…! বারে-বারে মনে হয় শুধু—এ শাস্তি তাঁহার নিজের দেওয়া। তিনি নির্মম নিষ্ঠুর।

এমন করিয়া কেদারবাবুর দিন যেন আর কাটিতে চায় না।

গত দু'টি মাসের মধ্যে বৈবাহিকের কাছ হইতে একটি মাত্র চিঠির জবাব পাইয়াছিলেন। তাও আবার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। শঙ্করীর কথা তিনি কিছুই লেখেন নাই।

ঘন ঘন 'তত্ত্ব' লইয়া লোক পাঠানো হয়। লোক-জন ফিরিয়া আসিয়া বলে, 'শঙ্করী আপনার মস্ত মেয়ে হয়েছে দেখলাম বাবু, আমাদের সঙ্গে কথাই বলে না।'

কেদারবাবু ভাবেন, এইবার তিনি নিজে গিয়া দেখিয়া আসিবেন। কিন্তু নিজের যাওয়া আর কোনো ক্রমেই হইয়া ওঠে না। শঙ্করীর শ্বশুর-শাশুড়ীর কথা-গুলা মনে হইতেই সর্ব্বশরীর কেমন যেন রী-রী করিতে থাকে, আত্ম-সম্মানে কোথায় যেন বাজে।

কিন্তু অপত্যস্নেহের জোয়ারে আত্মসম্মান ভাসিয়া যায়। মনে-মনে সঙ্কল্প করেন, এবার আর কোনও কথা নয়, এবার তিনি নিজে গিয়া কন্যাকে তাঁহার একটিবার মাত্র চোখে দেখিয়া আসিবেন।

ইহাই স্থির করিয়া কেদারবাবু শঙ্করীর কাছে যাইবার আয়োজন করিতেছেন, এমন দিনে হঠাৎ একটি গরুর গাড়ীতে চড়িয়া শঙ্করী তাঁহার দরজায় আসিয়া নামিল।

কেদারবাবু আনন্দে একেবারে নির্ব্বাক্ হইয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'হঠাৎ ...কই চিঠিপত্র...একটা খবর—'

শঙ্করী নীরবে তাহার আয়ত দুইটি চক্ষু পিতার মুখের দিকে তুলিয়া আবার হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

গাড়োয়ান কাঁধ হইতে তাহার বাক্সটা নামাইয়া দিয়া কাপড়ের খুঁটে-বাঁধা চিঠিখানি বাহির করিয়া কেদারবাবুর পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়াই চলিয়া যাইতেছিল। বাবু বলিলেন, 'কি রে, চলে যাচ্ছিস যে, বোস্, খেয়ে-দেয়ে সেই ও-বেলায় যাবি।'

'আজ্ঞে না, হুকুম নেই।' বলিয়া গাড়োয়ানটা চলিয়া গেল।

কেদারবাবু চিঠিখানি খুলিয়া পড়িলেন।

সর্ব্বনাশ!

বৈবাহিক লিখিয়াছেন,—

'পুরা ছয়টি মাস ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াও কন্যাকে আপনার বশে আনিতে পারিলাম না। অন্যান্য গুরুজনদের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু অতবড় ধিঙ্গি মেয়ে হইয়াও স্বামীকে যে চিনিতে পারিল না, এমন-কি তাহাকে কিল চড় লাথি মারিতেও যে কসুর করে না, তাহাকে আর আমার বাড়ীতে রাখিতে সাহস করিলাম না, আপনার মেয়ে আপনার কাছেই পাঠাইয়া দিলাম।'

চিঠি পড়িয়া কেদারবাবু আনন্দিত হইলেন। বলিলেন, 'বেশ হয়েছে। আমার মেয়ে আমার কাছে আসবে না ত' যাবে কোথায় ? আমি নিজে গিয়েই নিয়ে আসতাম। শয়তান বেটারা মেয়েটাকে আমার মেরে' ফেলবার চেষ্টা করেছিল। বেশ হয়েছে মা, বেশ হয়েছে, আচ্ছা হয়েছে।'

কথাটা ধীরে ধীরে গ্রামের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল।

ছড়াইয়া পড়িল এই ভাবে যে,—শঙ্করীকে তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী তাড়াইয়া দিয়াছে, আর কখনও তাহাকে লইয়া যাইবে না।

শঙ্করীর চেয়ে বয়সে যাহারা বড়, সেই সব মেয়েরা তাহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'না মা, কিছু জিজ্ঞেস্ করতে তোকে' ভয় করে। হ্যাঁ লা, কেন তাড়িয়ে দিয়েছে বল্ দেখি ?'

শঙ্করী তাহাদের ভেংচি কাটিয়া জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, তাড়িয়ে দিয়েছে! যা-খুশী তাই অমনি বল্‌লেই হলো কি না! তাড়িয়ে দিয়েছে ত' দিয়েছে—তাতে তোমাদের কি বাপু?'

সমবয়সী যাহারা—সদ্য-বিবাহিতা, শঙ্করীর সঙ্গে পুকুরে স্নান করিতে গিয়া শ্বশুরবাড়ীর কথা কয়, স্বামীর গল্প করিতে গিয়া মশ্‌গুল হইয়া ওঠে।

শঙ্করীর সঙ্গে নীরুর ভাব যেন একটুখানি বেশি। আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া নীরু তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোদের কি হয়েছিল লা?'

শঙ্করী হাসিতে হাসিতে বলে, 'শুনবি?'

বলিয়া তাহার কানে-কানে চুপি-চুপি অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা হয়। তাহার পর দু'জনেই হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে।

নীরু বলে, 'ওমা! এই কথা!'

ঘাড় নাড়িয়া শঙ্করী বলে, 'হ্যাঁ!'

নীরু বলে, 'তবে যে বলে তোকে না-কি তাড়িয়ে দিয়েছে?'

তাড়াইয়া দিবার কথাটা বলিতে শঙ্করীর লজ্জা হয়। বলে, 'হ্যাঁ, তাড়িয়ে দিয়েছে না কচু! আবার আসবে দেখিস্।'

দিনকতক পরেই দেখা গেল, নীরুকে যে-কথা সে বলিয়াছিল অত্যন্ত সন্তর্পণে, সেই কথা লইয়াই ডাবিদের বাড়ীতে প্রকাশ্যে আলোচনা চলিতেছে।

শঙ্করী গিয়াছিল ডাবিকে জিজ্ঞাসা করিতে—বৈকালে সে আজ বাঁধা-পুকুরে কাপড় কাচিতে যাইবে কি-না। জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া সে তাহাদের উঠানের পেয়ারা গাছটার নীচে দাঁড়াইয়া ছিল।

কম্‌লি তাহাকে দেখিবামাত্র হাসিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। আঙুল বাড়াইয়া আর-সবাইকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'ওই ছাখ্ কে এসেছে! বলি হ্যাঁ লা, শঙ্করী, শোন্ শোন্ এই দিকে আয়!'

'কি বলছিস্?' বলিয়া শঙ্করী আগাইয়া আসিল।

কমলি জিজ্ঞাসা করিল, 'বরের গালে বুঝি মেরেছিলি এক—চড় ?'

শঙ্করী রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'কে বললে শুনি ?'

'সবাই বলছে।'

শঙ্করী বলিল, 'তারা দেখতে গিয়েছিল বুঝি ?'

কমলি বলিল, 'দেখতে যাবে কেন, তুই-ই ত' বলেছিস্ হাবিকে।'

হাবি তাহাদের দলের মধ্যেই বসিয়া ছিল। বলিল, 'না ভাই, ও বলে নি, আমি শুনিছি, লিলির কাছে।'

লিলি বলিল, 'আমি শুনেছি পাঁচির কাছে।'

কিন্তু পাঁচি সেখানে অনুপস্থিত। সুতরাং মীমাংসা কিছুই হইল না। নারুর নামটা কেহই করিল না দেখিয়া শঙ্করীর জোর বাড়িল। বলিল, 'এই চললাম আমি পাঁচির কাছে, না যদি বলা হয় ত—'

সেই দিন হইতে কথাটা একরকম চাপাই পড়িয়া গেছে। সে সম্বন্ধে কেহ আর কোনোরূপ উচ্চবাচ্য করে না।

কথা উঠিলে বরং নিজেরাই চাপা দেয়। বলে, 'কাজ কি ভাই পরের কথা নিয়ে। বলে, নিজের ভাবনাই কে ভাবে তার ঠিক নেই।'

কিন্তু মাসখানেক পরে নিজের ভাবনা ভুলিবার মত একটা সংবাদের মত সংবাদ পাওয়া গেল,—শঙ্করীর বর না-কি আবার বিবাহ করিয়াছে। সে আর তাহাকে গ্রহণ করিবে না।

খবরটা সত্য কি না তাহারই যাচাই চলিতে লাগিল।

কেদারবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ মা, সত্যি। কি করব বল্,—আমার—' বলিয়া কথাটা তিনি আর শেষ করিতে পারিলেন না। কম্পিত হস্তে নিজের কপালটা দেখাইয়া দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিরতিশয় বেদনায় কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

এ সংবাদ কিছুদিন আগে পাইলে শঙ্করী কি করিত জানি না, কিন্তু সেদিন সে রাত্রির অন্ধকারে

বিছানায় শুইয়া কেবলমাত্র এপাশ-ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। মাথার চুল ছিঁড়িয়া, হাত কামড়াইয়া, উঠিয়া বসিয়া একাকী সেই নির্জ্জন গৃহের স্তব্ধ অন্ধকারে এমন-সব কাণ্ড করিতে আরম্ভ করিল যাহা দেখিলে মনে হয় মেয়েটা হঠাৎ বুঝি-বা পাগল হইয়া গেছে।

কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে গোপনে সে যাহা করিল, দিনের আলোকে কেহ সে-কথা টেরও পাইল না।

সকলে ভাবিয়াছিল, মেয়েটা সুন্দরী হইলে কি হইবে, দেমাগ্‌ যাহার এত বেশি, স্বামী তাহার বিবাহ করিয়া ভালই কাজই করিয়াছে। শঙ্করীর গুমর এইবার ভাঙ্গিবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু অবাক্‌ কাণ্ড!

শঙ্করী দিব্যি হাসিয়া হাসিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এত বড় যে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেছে তাহার এতটুকু চিহ্নমাত্র সে-মুখে কোথাও স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া ওঠে না।

কিন্তু হিতৈষী মেয়েদের তাহা ভাল লাগিবে কেন?

শঙ্করীর সঙ্গে দেখা হইবামাত্র কেহ-বা গালে হাত দিয়া সাহানুভূতি জানায়—ও মা গো। বলে, এমন

সুন্দর পিতিমের মত মেয়ে ছেড়ে মুখপোড়া কি না আর একটা বিয়ে করলে !'

আবার কেহ-বা শঙ্করীকে খুঁচিয়া খুঁচিয়া বলে, 'বলি হ্যাঁ'লা, কোথাকার হাবা মেয়ে লা তুই ! মনে একটু দুঃখু হয় না তোর ! আমরা হ'লে ত' কেঁদেই সারা হতাম ।'

শঙ্করী সেখান হইতে তাড়াতাড়ি পলাইতে পারিলে বাঁচে ।

হয় ত' আড়ালে গিয়া আজকাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, কিন্তু নীরুর কাছে গিয়া দু'টা মনের কথা কয় ।

নীরুর সঙ্গেই ভাব যেন একটুখানি বেশি ।

শেষে নীরুই একদিন আবিষ্কার করিল, শঙ্করী পোয়াতি ।—'ওমা, সেই এসে' অব্‌ধি ? কই এতদিন তবে বলিস্ নি যে লা ?'

লজ্জায় শঙ্করীর কান পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল । বলিল, 'যাঃ ! আমার লজ্জা করে ।'

কথাটা এ-কান ও-কান হইতে হইতে কেদারবাবুর

কানে গিয়া পৌঁছিল। আনন্দে আত্মহারা হইয়া চোখ দুইটা তাঁহার ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ তিনি দুর্গার মন্দিরে গিয়া হাতজোড় করিয়া মা মা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে প্রতিমার বেদীর সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।—'করুণাময়ী মা আমার, তুই আমার মুখ রক্ষা করিয়াছিস্ মা! শঙ্করী যেন আমার পুত্রবতী হইয়া সকল দুঃখ ভুলিতে পারে।'

শঙ্করীর তত্ত্বাবধানের জন্য সেইদিনই কেদারবাবু গ্রামের একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণের মেয়েকে নিজের ঘরে আনিয়া রাখিলেন। তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিয়া দিলেন, শঙ্করী ছেলেমানুষ, কিছুই জানে না, তার সমস্ত ভার তোমার ওপর দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম মা। চব্বিশ ঘণ্টা তুমি যেন তার কাছে কাছে থেকো।'

কেদারবাবুর আনন্দ যেন আর ধরে না।

সেদিন কি-একটা কাজের জন্য তিনি শহরে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া বাড়ীতে পা দিয়াই ডাকিলেন, 'শঙ্করী!'

না ডাকিলে শঙ্করী আজকাল তাহার বাবার কাছে আসিয়া দাঁড়ায় না। গায়ের কাপড়টা ভাল করিয়া জড়াইয়া লইয়া শঙ্করী ধীরে-ধীরে বাহিরে আসিয়া বলিল, 'কি বাবা ?'

'তোর জন্যে আজ কি এনেছি বল্ দেখি মা ?'

শঙ্করী বলিল, 'রোজ রোজ কী যে তুমি করছ বাবা !'

হাসিয়া কেদারবাবু বলিলেন, 'বল্ না পাগলী, কি এনেছি বল্ !'

শঙ্করী বলিল, 'কোথায় আছে বল—দেখি আগে।'

'হ্যাঁ, দেখে অমন্ সবাই বলতে পারে। পকেটে আছে।'

শঙ্করী তাঁহার পকেটে হাত দিয়া বাহির করিল—দুইটি পাকা আম।

পৌষ মাসে পাকা আম। দুর্লভ নিঃসন্দেহ।

শঙ্করী বলিল, 'রোজ রোজ কেন এত খরচ কর বাবা আমার জন্যে ?'

'কেন করি ?' কেদারবাবু হাসিয়া তাঁহার মেয়ের মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'তোর একটা ছেলেমেয়ে হোক্ আগে, তার পর বুঝবি।'

এমনি প্রত্যহ।

যা' তিনি কখনও করেন না, আজকাল তাহাই করিতে লাগিলেন। গ্রামের রাস্তা দিয়া পার হইয়া যাইতেছেন, মাখন ময়রা তাহার চালায় বসিয়া উনানে কড়াই চড়াইয়া বেগুনী ভাজিতেছে। কেদারবাবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন—'কি হে মাখন, বেগুনী ভাজছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, লোকে আজকাল···শীতকাল কি না,···' বলিতে বলিতে বেসম-মাখা হাতেই মাখন একটি প্রণাম করিয়া তটস্থ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

পকেট হইতে চারিটি পয়সা বাহির করিয়া কেদারবাবু বলিলেন, 'দে ত' বাবা, চার পয়সার। মেয়েটা বেগুনী খেতে বড় ভালবাসে।'

মাখন অবাক্ হইয়া গেল। অত বড় লোকটা হাতে করিয়া চার পয়সার বেগুনী লইয়া যাইবে···মাখন বলিল, 'আমি দিয়ে আসছি আজ্ঞে, আপনি বসুন।'

'না রে না, কাজ ছেড়ে তোকে আর যেতে হবে না, দে।'

বলিয়া তিনি হাত পাতিয়া শালপাতার ঠোঙায় বেগুনী লইয়া বাড়ী গেলেন।

কোনো দিন হয় ত' ছেলেরা পেয়ারা গাছে চড়িয়া পেয়ারা পাড়িতেছে। কেদারবাবু ধীরে-ধীরে তাহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'কই দেখি রে, দে দেখি দুটো পেয়ারা আমায়!'

এমনি করিয়া আদর-যত্নে শঙ্করীর দিন কাটিতে থাকে।

শঙ্করী আজকাল আর বড়-একটা বাড়ীর বাহির হয় না, সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবেরাই তাহার কাছে আসিয়া গল্প করে, বই পড়ে, তাস খেলে, গান গায়, বাজি রাখে;—বলে, 'শঙ্করীর মেয়ে হবে কি ছেলে হবে ঠিক্ করে' যে বলতে পারবি তাকে পাঁচ টাকার সন্দেশ।'

কেহ বলে, 'মেয়ে।'

কেহ বলে, 'ছেলে।'

'আচ্ছা তবে দেখাই যাক্, কার কথা ঠিক হয়।'

দেখিতে দেখিতে দশটি মাস কাটিয়া গেল।

তাহার পর আষাঢ়ের এক বর্ষণ-মুখর প্রভাতে শঙ্করীর হইল একটি মেয়ে।

'আহা, একটি ছেলে হ'লেই বেশ ভাল হ'তো।'

'তা হোক্, মেয়ে ত' আর ফেল্না নয় মা!'

কেদারবাবু রাত্রির শেষ প্রহর হইতে দুর্গা-বাংলায় বসিয়া বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্তব পাঠ করিতেছিলেন। সংবাদ পাইয়া ভিজিয়া ভিজিয়া বাড়ী আসিয়া সর্ব্বপ্রথমেই পঞ্জিকা খুলিয়া মেয়ের জন্মক্ষণ, তারিখ ইত্যাদি লিখিয়া রাখিলেন। সদ্যপ্রসূত শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। ধাত্রী আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। একটি গিনি হাতে দিয়া কেদারবাবু নাৎনীর মুখ দেখিলেন। সাদা ধপ্‌ধপে

গায়ের রং, বড় বড় চোখ, মাথায় কৃষ্ণ কুঞ্চিত চুল…বহু কাল পূর্ব্বে শঙ্করীর জন্মক্ষণটি তাঁহার মনে পড়িল। সেও ঠিক এই রকমই দেখিতে হইয়াছিল। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, 'দেখতে অবিকল আমার শঙ্করীর মতই হয়েছে।'

বহু কালের বৃদ্ধা ধাত্রী শঙ্করীর জন্মদিনেও উপস্থিত ছিল; কিন্তু দেখিতে সেও ঠিক এই রকমটিই ছিল কি না সে-কথা আজ আর তাহার মনে নাই; না থাকিলেও ঘাড় নাড়িয়া কেদারবাবুর কথায় সায় দিয়া বলিল, 'আজ্ঞে হঁ্যা বাবু, একেবারে হুবহু ঠিক মায়ের মত।'

কাপড় জামা বদলাইয়া শঙ্করী তখন আঁতুড় ঘরের এক পাশে নিজ্জীবের মত শুইয়া ছিল। কথা-গুলা তাহার কানে যাইতেই একাগ্র করুণ দৃষ্টিতে সে তাহার সদ্যোজাত কন্যার মুখের পানে তাকাইয়া, মনে-মনে সর্ব্বদেবতার চরণে প্রণাম করিয়া জানাইল,—মেয়ে যদি দেখিতে ঠিক তাহারই মত হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু হে ভাগ্যনিয়ন্তা, হে অদৃশ্য লিপিকার, কন্যার ললাট-লিপি যেন ঠিক তাহারই অদৃষ্টলিপির অনুরূপ

অনুকৃতির না হয়; বাল্যাবধি সেও যেন ঠিক তাঁহারই মত দুরন্ত চঞ্চল হইয়া আজীবন শুধু দুঃখ, দুর্ভোগ, আর বঞ্চনা সহ্য না করে!

শঙ্করীর শিশুকন্যার প্রতিদিনের প্রত্যেকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ নাই-বা করিলাম। করিবার প্রয়োজনও কিছু নাই।

অনেক ভাবিয়া ভাবিয়া কেদারবাবু তাহার নাম রাখিলেন—অপর্ণা। অপর্ণা—দেবী দুর্গার নাম। কেদারবাবু শঙ্করীকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'মার কাছে আমি অনেক সাধ্য-সাধনা, অনেক আরাধনা করেছি শঙ্করী, তাই মা আমার ঘরে জন্ম নিয়েছেন। মার পূজো এ-বছর আমি কেমন করে' করব দেখিস্।'

পূজায় সে-বৎসর সত্যই ধূমধামের আর অন্ত রহিল না। সমস্ত খরচ কেদারবাবু নিজে বহন করিলেন।

তবে এত আনন্দের মধ্যেও একটি দুঃখ তাঁহার

বুকের মধ্যে অনির্ব্বাপিত বহ্নিশিখার মত অহরহ জ্বলিতে লাগিল। অপর্ণার জন্মাবধি আজ পর্য্যন্ত কত চিঠি যে তিনি তাঁহার জামাতাকে লিখিয়াছেন, কতবার গোপনে যে তাহাকে আনিতে পাঠাইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু আসা দূরে থাক্, জামাতা কিম্বা বৈবাহিক—কেহই তাঁহার চিঠির একখানি জবাব পর্য্যন্ত দেওয়া সঙ্গত মনে করে নাই।

না করুক্। অপর্ণাকে কোলে লইয়া, তাহার মুখের পানে তাকাইয়া, কেদারবাবু তাঁহার সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া যান; দিবারাত্রির মধ্যে অধিকাংশ সময় অপর্ণাকে তিনি তাঁহার কাছে-কাছে রাখেন; শঙ্করীকে ডাকিয়া বলেন, 'হ্যাঁ মা শঙ্করী, বুড়ো বয়েসে শেষে কি আমার সেই জড়-ভরতের মত হ'লো না কি রে?'

আবার কখনও-বা ম্লান একটুখানি হাসিয়া বলেন, 'অপর্ণা বড় হবে, তার বিয়ে দেবো—ততদিন বাঁচব ত' মা?'

শঙ্করী বলে, 'বালাই ষাট্! ও-সব কথা কেন বলছ বাবা?'

কিন্তু শঙ্করীর সর্ব্বদাই ভয় হয়, বাবা যে-রকম ভাবে মেয়েটাকে আদর দিতে সুরু করিয়াছেন, শেষে সে ঠিক তাহারই মত না হইয়া যায়। দুরন্ত চপল হওয়ার যে-দুঃখ, সে-দুঃখ শঙ্করী আজ তাহার মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে। ধন নয়, জন নয়, মান নয়,—এই অট্টালিকা এই অর্থ-সম্পদ, পিতার স্নেহ, বন্ধুর প্রীতি, এত সোহাগ, এত' আদর, এত যত্ন,—আজ সবই যেন তাহার কাছে নিরর্থক; অন্তঃসারশূন্য, নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। নারী-জীবনের একমাত্র কাম্য—স্বামীর এতটুকু স্নেহ-সোহাগ হইতে বঞ্চিত তাহার অপর্ণাও যেন না হয়!

মেয়েটা তাই কাঁদিয়া-কাটিয়া বায়না ধরিলে ওই অতটুকু মেয়েকেও শঙ্করী নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত চড়-চাপড় মারিয়া চুপ করাইতে গিয়া আরও কাঁদাইয়া দেয়। কান্না শুনিয়া কেদারবাবু ছুটিয়া আসেন। রাগিয়া শঙ্করী বলে, 'কাঁদুক বাবা, এখন থেকে অত বেয়াড়া হ'তে ওকে তুমি দিও না।'

মেয়ে তাঁহার এতদিনে বুঝিয়াছে।

শঙ্করীর মুখ-চোখের চেহারা দেখিয়া কেদার-বাবুকেও কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে হয়।

পরে বলেন, 'কিন্তু দেখে নিস্ শঙ্করী, অপর্ণা তুরন্ত চঞ্চল কখনও হবে না। ও যে মা-দুর্গা এসেছে আমার বাড়ী, সে-কথা ত' তোকে আগেই ব'লে দিয়েছি।'

পাঁচ বছরের অপর্ণা একদিন তাহার এক খেলার সাথীকে এমন মার মারিল যে তাহার মা আসিয়া মেয়েটার কপালের রক্ত দেখাইয়া শঙ্করীকে অনেক কথাই শুনাইয়া দিয়া গেল।

শঙ্করী আর না চাহিল বাট্, অপর্ণার মাথার উপর জোরে-জোরে গোটাকতক চড় বসাইয়া দিয়া তাহার কানে ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে কেদার-বাবুর কাছে লইয়া গিয়া বলিল, 'নাও বাবা, তোমার মা-দুগ্‌গার কীর্তি ছাখো! ভবানীর মেয়েটাকে এমন মার মেরেছে যে, তার কপালের চামড়া কেটে রক্ত

বেরিয়ে গেছে। আমি জানি বাবা, ওর অদৃষ্টে যে কি আছে তা আমি জানি।' বলিয়া অভিমান-ভরে সজল চক্ষে শঙ্করী তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেল।

অপর্ণা হইয়াছে ঠিক শঙ্করীর মত। বাল্যকালে দেখিতে সে ঠিক যেমনটি ছিল, অপর্ণাও দেখিতে ঠিক তেমনি হইয়াছে,—তেমনি দুরন্ত, তেমনি চপল।

শঙ্করীর এত প্রার্থনা, দেবতার কাছে এত মাথা কুটা-কুটি সবই যেন ব্যর্থ করিয়া দিয়া অপর্ণা দিনে-দিনে আরও বেশি দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল।

মারিয়া, শাসন করিয়া শঙ্করী কোনো প্রকারেই যখন অপর্ণাকে বুঝাইয়া বশে আনিতে পারে না, তখন সে দোষ দেয় তাহার বাবার। বলে, 'বাবাই আমার যত নষ্টের মূল। আমার সর্ব্বনাশের ত' আর বাকি নেই, আবার মেয়েটারও সর্ব্বনাশ না করে' ছাড়বে না। আমরা না হয় সহ্য করছি, পরে সহ্য করবে কেন মা?'

যাহারা শোনে, তাহারা হয় ত খোদামুদি করিয়া বলে, 'ছেলেমানুষ—অমন একটু-আধটু হয়ই, বড় হ'লে শুধরে যাবে দেখো।'

শঙ্করী ঘাড় নাড়িয়া প্রতিবাদ করে। বলে, 'না মা, তা হয় না।

বলিয়া তাহার নিজের কথাটা মনে পড়িয়া যায়। একাকী কোনও নির্জ্জন ঘরে গিয়া কাঁদিতে বসে। কল্পনায় সে যেন অপর্ণার ভবিষ্যৎ তাহার চোখের সুমুখে দেখিতে পায়। মনে হয়, অপর্ণা বড় হইয়া শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে, সেখানে সকলে তাহাকে বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিতেছে, শাশুড়ী-ননদের অত্যাচারের আর সীমা নাই, স্বামী তাহাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না,—অবশেষে একদিন সকলে মিলিয়া জোট পাকাইয়া পরামর্শ করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল। অভাগী মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল মায়ের কাছে। কাহারও দুঃখ কাহাকেও মুখ ফুটিয়া বলিবার জো নাই! সারা জীবন ধরিয়া দু'জন দু'জনের মুখের পানে চাহিয়া শুধু কান্না!—এই ত' পরিণাম!

শঙ্করী শেষে আর পারিয়া উঠিল না। আশা ভরসা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া মেয়ের হাল ছাড়িয়া দিয়া একেবারে নির্ব্বিকার-উদাসীন হইয়া সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে কথায়-গল্পে দিন কাটাইতে লাগিল। অপর্ণা যেন

তাহার কেহই নয় ; তাহার সঙ্গে যেন তাহার কোনও সম্বন্ধই নাই !

মা'র কাছে অপর্ণা কোন-কিছুর জন্য নালিশ করিতে আসিলে শঙ্করী বলে, 'আমি কি জানি ! যা বাবার কাছে যা।'

বাবা বলেন, 'হ্যাঁ মা শঙ্করী, এমন করে' মেয়ের হা'ল ছেড়ে দিলে কেমন করে' কি হবে বল্ ত ? আমি আর কত দিন বাঁচব মা ?'

সত্যই ত ! বাবার বয়স হইয়াছে। আজ হোক্ কাল হোক্ দশ দিন পরে হোক্ একদিন তাঁহাকে বিদায় লইতেই হইবে। সে কথাটা এতদিন একটি দিনের জন্যও শঙ্করীর মনে হয় নাই। আজ হঠাৎ তিনি নিজেই কথাটা তাহাকে মনে করাইয়া দিলেন। শঙ্করী তাহার ঘরে গিয়া একাকী তাহার বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া, বহুক্ষণ ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।—'হে মা দুর্গা, হে মা কালী, বাবাকে আমার আরও কিছুদিন বাঁচাইয়া রাখিও।'

শঙ্করীর ইচ্ছা, বারো-তেরো বছর বয়সে অপর্ণার বিবাহ সে কিছুতেই দিবে না। অথচ কেদারবাবু ঠিক সেই একই কথা বলিয়া জেদ ধরিয়া বসিলেন,—'শরীর আমার সত্যিই ভেঙ্গে পড়েছে মা, আর ত' বেশি দিন বাঁচব না, অপর্ণার বিয়েটা আমায় দেখে যেতে দে।'

মুখে শঙ্করী কিছুই বলিতে পারিল না, কিন্তু মনে মনে বলিল, 'হ্যাঁ, মেয়ে আমার মত হোক্ আর-কি! তখন ত' আর তুমি পুড়তে আসবে না, জ্বলে পুড়ে মরব আমিই।'

শঙ্করীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া কেদারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন, ভাবছিস কি শঙ্করী? বিয়ে দেবার বুঝি তোর ইচ্ছে নেই?'

মাথা হেঁট করিয়া শঙ্করী বলিল, 'আর-একটু বড় না হ'লে বুদ্ধি-সুদ্ধি…'

কথাটা সে আর শেষ করিতে পারিল না।

কেদারবাবু বলিলেন, 'ভাবিস্‌নে মা, আমি আশীর্ব্বাদ করছি ওকে। ও সুখী হবে। তা নইলে আমি আর দেখতে পাব না।'

শঙ্করা ভাবিল, আশীর্ব্বাদ তিনি তাহাকেও করিয়াছিলেন। ও-কথার কোনও মূল্য নাই। বাবার কাছে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলাও যায় না। অথচ ওই দুরন্ত মেয়ের এই এত কম বয়সে জোর করিয়া বিবাহ দিবেন এবং তাহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত যাহা ঘটিবে—ভুক্তভোগী সে নিজে, তাহা বেশ ভাল করিয়াই জানে।

ছেলে একটি বেশ ভালই পাওয়া গেল। মুক্তাজোড়ে বাড়ী। গরুর গাড়ীতে চড়িয়া কেদারবাবু নিজে গিয়া দেখিয়া আসিলেন। ছেলেটি দেখিতেও চমৎকার। কলিকাতার কোন্ একটা কলেজে আই-এ পড়িতেছে। অপর্ণার সঙ্গে মানাইবে ভাল।

কেদারবাবু আর দেরি করিলেন না। গরমের ছুটিতে ছেলেটি বাড়ী আসিল। সেই সময়েই তিনি দিন স্থির করিয়া অপর্ণার বিবাহ চুকাইয়া দিলেন।

যেমন ছেলে তেমনি মেয়ে!

পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া কেদারবাবু রাজ্যের লোক জড়ো করিতে লাগিলেন।

তা দেখিবার বস্তুই বটে।

শঙ্করীকে শাশুড়ী বলিয়া মনেই হয় না। মেয়ে-জামাই প্রণাম করিলে পর লজ্জায় তাহার মুখ দিয়া আশীর্ব্বাদের কথা ফুটিল না। মনে-মনেই বলিল, 'তোমরা সুখী হও।' মায়ের মন,—আরও কত-কীই যে বলিল তাহা একমাত্র অন্তর্য্যামীই জানেন।

আশীর্ব্বাদ করিল বটে, কিন্তু বুকের ভিতরটা তাহার দুর্‌দুর্‌ করিতে লাগিল। নিজের বিবাহিত জীবনের প্রতিদিনের তুচ্ছ ঘটনাটি পর্য্যন্ত আজও সে ভুলিতে পারে নাই। মেয়েকে সে তাহার চেনে, এবং চেনে বলিয়াই বেশি ভয়! তাই সে তাহাদের ঘরের মা-দুর্গা হইতে আরম্ভ করিয়া নূতন পুকুরের পাড়ে তেঁতুলগাছের তলায় যে ব্রহ্মচারী-বাবাজি আছেন, তাঁহাকে পর্য্যন্ত মনে-মনে 'তাহার সহস্র কোটি প্রণাম জানাইয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল যে,

তাহার যা হইবার তা' হইয়া গেছে, তেমনটি যেন আর তাহার মেয়ের কপালে না হয়!

কেদারবাবু কেমন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন কে জানে। অপর্ণার বিবাহ দিয়া দু'মাস পার হইতে না হইতেই হঠাৎ একদিন বৈকালে তাঁহার জ্বর হইল এবং তিন দিন অবিশ্রান্ত জ্বরভোগের পর চারদিনের দিন সকালে শঙ্করী ও অপর্ণাকে কাছে ডাকিয়া তাহাদের গায়ে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া এবং তাঁহার জন্য কোনরূপ চিন্তা করিতে না বলিয়া দিব্য সজ্ঞানে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া চক্ষু স্থির করিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে নাভিশ্বাস উঠিল এবং মিনিট-কয়েকের মধ্যেই বার-কতক্ হিক্কা তুলিয়া তিনি শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

শঙ্করী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অপর্ণাও কাঁদিতে লাগিল। ভাই, ভ্রাতৃবধূ, জ্ঞাতি কুটুম্ব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপড়শী সকলেই আসিয়া জড়ো হইল।

কেদারবাবুর অবশ্য মরিবার বয়স হইয়াছিল, দুঃখ করিবার কিছু নাই। তবে শঙ্করী ছেলেমানুষ, তাহারই

মাথার উপর সব দিক রক্ষা করিবার ভার আসিয়া পড়িল, এই যা দুঃখ।

শঙ্করী এই ভয়ই করিয়াছিল। অপর্ণাকে লইয়া যদি একটা-কিছু হয় ত' এইবার সাম্‌লাইবে কে ?

একমাস পরেই পূজা।

এ বৎসর শঙ্করীর চোখে পূজা আসিল কান্না লইয়া। ষষ্ঠীর দিন হইতে সে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিল, চুপ করিল বিজয়ার দিন।

পূজার ছুটিতে শঙ্করীর জামাইটি কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিয়াছিল; বিজয়ার দিন আসিল শাশুড়ীকে প্রণাম করিতে। জামাইএর সুমুখে কান্নাকাটি করা উচিত নয় বলিয়াই সে জোর করিয়াই কান্না চাপিয়া রাখিল।

সরকারকে পাঠাইল পুকুরে মাছ ধরিতে এবং সারাদিন ধরিয়া সেদিন সে জামাইএর সুখ-সুবিধার আয়োজনেই ব্যস্ত হইয়া রহিল।

কিন্তু সমস্ত কাজকর্ম্মের মাঝখানে একমাত্র অপর্ণার চিন্তাটাই তাহাকে নিরতিশয় ব্যথার মত নিরন্তর পীড়া করিয়া তুলিতে লাগিল।

উপরের ঘরে জামাইকে থাকিতে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু একটিবারের জন্যও অপর্ণা সে-পথ মাড়ায় নাই। রাত্রে আজ সে তাহাকে সেখানে পাঠাইতে পারিবে কিনা কে জানে।

দিনের পর রাত্রি আসিল। শঙ্করী কাছে বসিয়া জামাইকে পেট ভরিয়া খাওয়াইল, খাওয়াইয়া উপরের ঘরে পাঠাইয়া দিয়া অপর্ণাকে বলিল, 'চল্।'

অপর্ণা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'যাঃ!'

'যা নয় মা, ওঠ, আর কেলেঙ্কারী করিস নে।' বলিয়া জোর করিয়া হাতে ধরিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে নিতান্ত নির্লজ্জের মত শঙ্করী তাহাকে উপরের ঘরের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া দরজাটা বাহির হইতে টানিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল।

তাহার পর সমস্ত রাত্রি শঙ্করীর চোখে আর ঘুম নাই।

অতি প্রত্যূষে পা টিপিয়া টিপিয়া শঙ্করী তাহাদের দরজার কাছে গিয়া কাণ পাতিয়া দাঁড়াইল। তাহারা ঘুমাইতেছে। নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। নিঃশব্দে দরজার শিকলটা খুলিয়া দিয়া সেখান হইতে তেম্‌নি চোরের মতই সে পলায়ন করিল।

এম্‌নি দিনের পর দিন।

কাহারও মুখে কোনও কথা নাই।

অপর্ণাকে প্রত্যহ জোর করিয়াই দিয়া আসিতে হয়। ভয়ে শঙ্করীর বুকের ভিতরটা দুরদুর্ করিতে থাকে।

জামাইটির হাসি-হাসি মুখ। সর্ব্বদাই হাসিয়া হাসিয়া কথা কয়। কিন্তু অপর্ণার কথা কিছু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা করে। অথচ অপর্ণাকে কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে গেলে সে তাহার গায়ে থুতু দিতে আসে।

তিন দিন পরে জামাই মাথা হেঁট করিয়া বলিল, 'মা, আজ আমি যাব বিকেলে।'

জামাইএর মুখে 'মা' ডাক শুনিবামাত্র আনন্দে

শঙ্করীর আপাদমস্তক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। বলিল, 'আজই যাবে? কেন বাবা, আর দু'দিন থেকেই যাও না! এখন ত' ছুটি তোমার?'

জামাই বলিল, 'না মা, পড়াশোনা···আর বাবা বলে দিয়েছিলেন······'

ইহার উপর আর কথা চলে না। মৌন নত মুখে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পাল্‌কির ব্যবস্থা করিয়া রাখিবার জন্য শঙ্করী তাহার সরকারকে ডাকিয়া পাঠাইল।

বেকালে ঝি আসিয়া জানাইল, 'জামাইবাবুর মাথা ধরেছে মা, আজ আর তাঁর যাওয়া হবে না।'

জামাইএর জন্য শঙ্করী জল-খাবার তৈরি করিতে-ছিল।—'মাথা ধরেছে? দাঁড়া ত' মা এইখানে একটু দেখে আসি।' বলিয়া তাড়াতাড়ি সে উপরে উঠিয়া গেল।

'কি বাবা, মাথা ধরেছে সুধাংশু?'

দেখিল, চাদরটা গায়ে টানিয়া লইয়া সুধাংশু খাটের উপর শুইয়া আছে। বলিল, 'সামান্য।'

'দেখি।' বলিয়া শিয়রের কাছে উঠিয়া বসিয়া শঙ্করী তাহার কপালে হাত দিয়া বলিল, 'কই না, গা ত' গরম হয় নি।'

এমন সময় ফিক্ ফিক্ করিয়া চাপা হাসির শব্দে সমস্ত ঘর যেন ভরিয়া গেল।

আচম্কা চারিদিকে চাহিয়া শঙ্করী কাহাকে দেখিতে পাইল না; কিন্তু এ-হাসি যে অপর্ণার, শঙ্করী তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। দুষ্টু মেয়ে হয় ত বাহিরে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে! অজানা আতঙ্কে শঙ্করীর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। সুধাংশু তাহার কন্যার এই নির্লজ্জ ব্যবহারে পাছে কিছু মনে করে ভাবিয়া আগে হইতেই সাম্লাইয়া লইবার জন্য বলিল, 'মেয়েটা ভারি চঞ্চল বাবা সুধা, তুমি কিছু মনে কোরো না বাবা, ছেলেমানুষ, অপরাধ নিয়ো না যেন।'

এবার আর শুধু হাসি নয়, অপর্ণা হুস্ করিয়া খাটের তলা হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং হাসিতে হাসিতে শায়িত সুধাংশুর গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া বলিল, 'বল্‌ব? বল্‌ব?—না মা, ওর কিচ্ছু হয়নি মা, মাথা

ধরেছে ব'লে চালাকি করে শুয়ে আছে মা, ও আজ যাবে না।'

'তাহ'লে আমিও বলি।' বলিয়া তড়াক্ করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া সুধাংশু বলিল, 'ও আজ আমায় এমন এক চড় মেরেছে মা! আমিও ওকে এমন মার মারব, আপনি কিছু তখন বলতে পারেন না বলে' রাখছি।'

বালিশটা অপর্ণা তাহার স্বামীর গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিল। বলিল, 'ধেৎ! বলব না বলে' আবার শেষে…'

বলিয়া কৃত্রিম অভিমানভরা হাস্যোজ্জ্বল মুখে উভয়ে উভয়ের মুখের পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাকাইয়া রহিল।

এ দৃশ্য শঙ্করী আজ কাহাকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাইবে? চোখ দুইটি সহসা তাহার জলে ভরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া পাশের ঘরে সে তাহার বাবার বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

শেষ